শুকতারা

ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ বর্ষ
নবম সংখ্যা
কার্তিক ১৩৯৭

অতিথি • সূত্রধর গুপ্ত • ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

ফ্যারেক্স-এগ একেবারে দুধের মতই সহজেই হজম হয়!

আপনার আদরের বাচ্চা ছয় মাসের হলেই ওকে ডিম ও দুধের প্রোটিন গুণে ভরা এক বিশেষ আহার দিতে শুরু করুন।

স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ভাবে আগে থেকে রান্না করা ফ্যারেক্স-এগ এমন বিশেষ ভাবে তৈরী, যা বাচ্চার কোমল পরিপাক শক্তিতে অতি সহজেই হজম হয়ে যায়।

প্রোটিন-সমৃদ্ধ

ফ্যারেক্স:
বেড়ে ওঠার এক স্বাদভরা উপায়!

যেকোনো দোকানে একই সাশ্রয়কর দামে পাওয়া যায়।

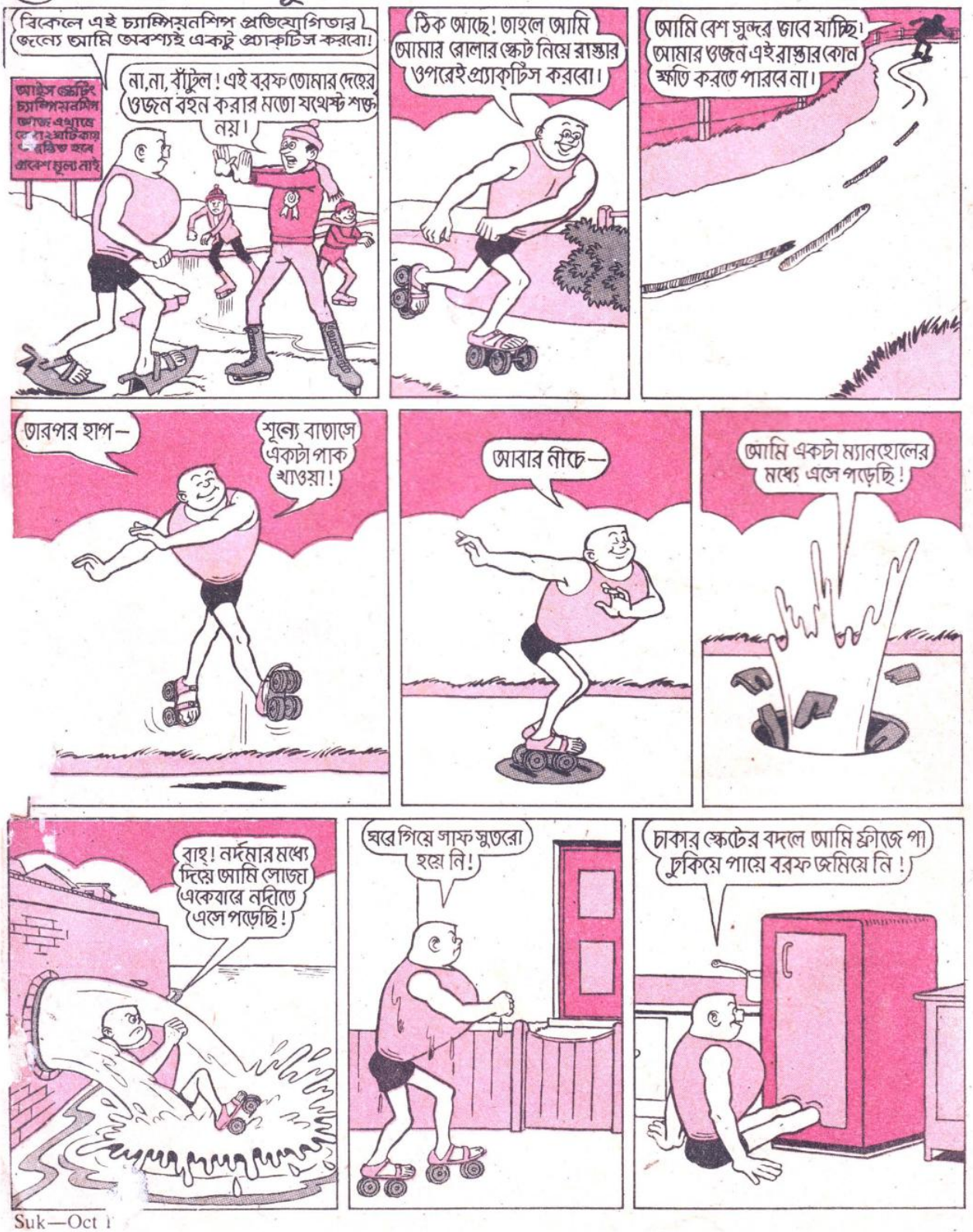

বাঁটুল দি গ্রেট
বিকেলে এই চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার জন্যে আমি অবশ্যই একটু প্র্যাকটিস করবো!
আইস স্কেটিং
চ্যাম্পিয়নশিপ
আজ এখানে
প্রবেশ মূল্য নাই
না,না, বাঁটুল! এই বরফ তোমার দেহের ওজন বহন করার মতো যথেষ্ট শক্ত নয়।
ঠিক আছে! তাহলে আমি আমার রোলার স্কেট নিয়ে রাস্তার ওপরেই প্র্যাক্টিস করবো।
আমি বেশ সুন্দর ভাবে যাচ্ছি। আমার ওজনে এই রাস্তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।
তারপর হাপ—
শূন্যে বাতাসে একটা পাক খাওয়া!
আবার নীচে—
আমি একটা ম্যানহোলের মধ্যে এসে পড়েছি!
বাহ্! নর্দমার মধ্যে দিয়ে আমি সোজা একেবারে নদীতে এসে পড়েছি!
ঘরে গিয়ে সাফ সুতরো হয়ে নি!
চাকার স্কেটের বদলে আমি ফ্রীজে পা ঢুকিয়ে পায়ে বরফ জমিয়ে নি!

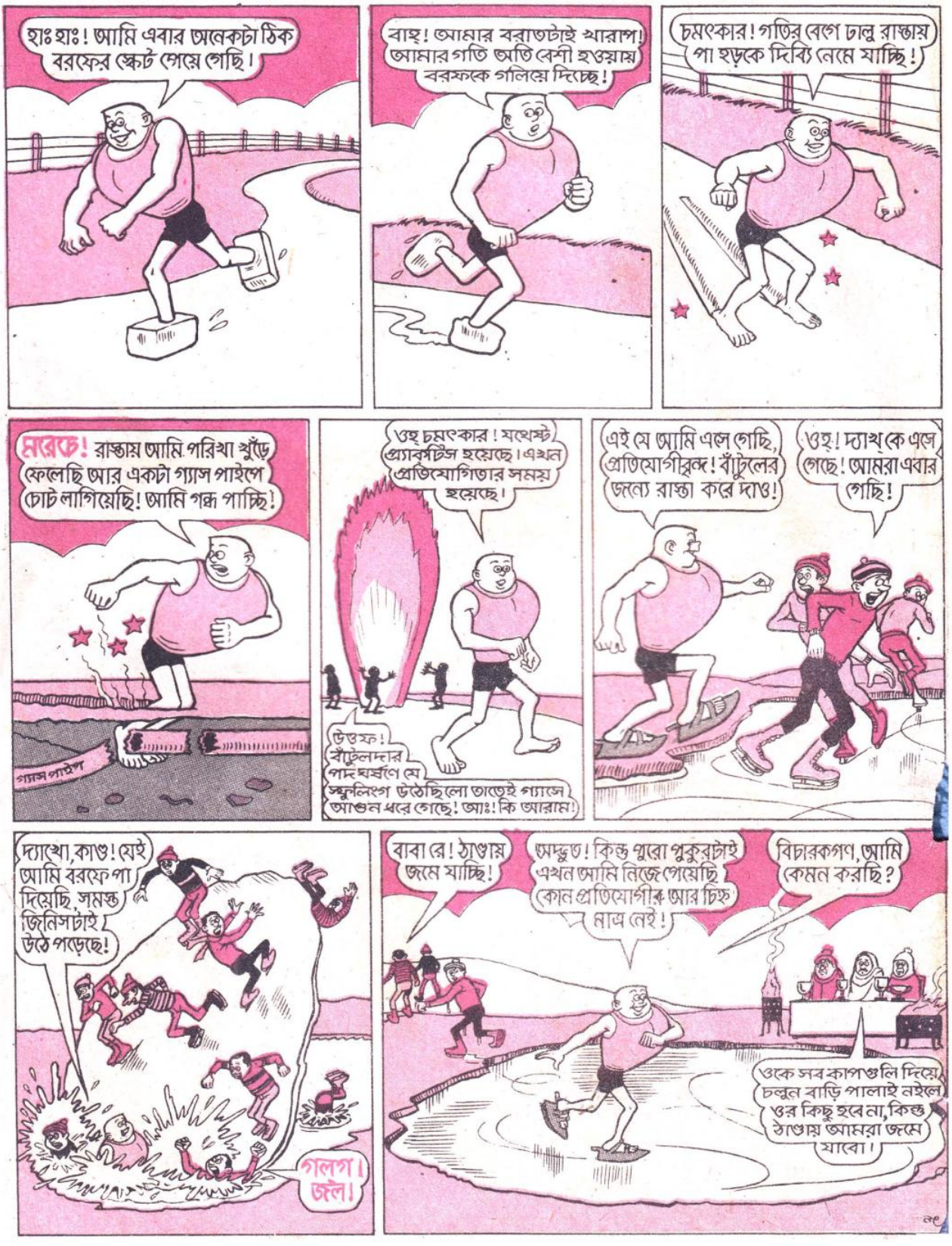
হাঃ হাঃ! আমি এবার অনেকটা ঠিক বরফের স্কেট পেয়ে গেছি।
বাহ্! আমার বরাতটাই খারাপ! আমার গতি অতি বেশী হওয়ায় বরফকে গলিয়ে দিচ্ছে!
চমৎকার! গতির বেগে ঢালু রাস্তায় পা হড়কে দিব্যি নেমে যাচ্ছি!
মরেচ! রাস্তায় আমি পরিখা খুঁড়ে ফেলেছি আর একটা গ্যাস পাইপে চোট লাগিয়েছি! আমি গন্ধ পাচ্ছি!
গ্যাস পাইপ
ওহ্ চমৎকার! যথেষ্ট প্র্যাকটিস হয়েছে। এখন প্রতিযোগিতার সময় হয়েছে।
উওফ! বাঁটুলদার পাদঘর্ষণে যে স্কুলিংগ উঠেছিলো তাতেই গ্যাসে আগুন ধরে গেছে! আঃ! কি আরাম!
এই যে আমি এসে গেছি, প্রতিযোগীবৃন্দ! বাঁটুলের জন্যে রাস্তা করে দাও!
ওহ্! দ্যাখ্ কে এসে গেছে! আমরা এবার গেছি!
দ্যাখো, কাণ্ড! যেই আমি বরফে পা দিয়েছি, সমস্ত জিনিসটাই উঠে পড়েছে!
গলগ। জল।
বাবা রে! ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি!
অদ্ভুত! কিন্তু পুরো পুকুরটাই এখন আমি নিজে পেয়েছি কোন প্রতিযোগীর আর চিহ্ন মাত্র নেই!
বিচারকগণ, আমি কেমন করছি?
ওকে সব কাপগুলি দিয়ে চলুন বাড়ি পালাই নইলে ওর কিছু হবে না, কিন্তু ঠাণ্ডায় আমরা জমে যাবো!

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
ছোটদের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

কার্ত্তিক ১৩৯৭/অক্টোবর ১৯৯০

প্রচ্ছদ □

অতিথি (রঙিন ছবিতে গল্প)
–সূত্রধর গুপ্ত

ধারাবাহিক □

ত্রয়ীর অভিযান (পোড়া বাড়ির রহস্য)–পরাশর রায় ২৬
রাক্ষসের দেশে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)–সবাসাচী ৩৩
নির্জন দ্বীপের ভয়ংকর (রহস্য উপন্যাস)–রবিদাস সাহারায় ১৪

রূপকথার গল্প □

ভাগ্য ফেরালো বেড়াল
–শ্যামাপদ কর্মকার ৫১

ভূতের গল্প □

হোইচির গল্প–শ্যামলী বসু ৬

অনুবাদ গল্প □

যেমন কর্ম তেমনি ফল–অসীম চৌধুরী ২০

সত্য ঘটনা □

জেঠুর বাঘ শিকার
–কান্তিলাল কোলে ৩১

ইতিহাসের গল্প □

পঁয়ষট্টি হাজারের 'তুর্কী নাচ'
–স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০

পুরস্কৃত গল্প □

রোবুর বন্ধু (প্রথম)
–ঝুমা মুখোপাধ্যায় ৭৩
স্বপ্নে আমার মনে হলো (দ্বিতীয়)
–মৌসুমী ভড় ৭৪

ভ্রমণ □

বদ্রী বিশাল–শতদল ভট্টাচার্য ৬০

অমর বাঙালী □

বাণেশ্বর বিদ্যালংকার–গৌরী সেন ৭৮

ফিচার □

অলৌকিক–কমল লাহিড়ী ৫৫
মেরী রোজ–শোভেন সানমুল ৭১
গল্প নয়, গল্পের মতো
–প্রিয়রঞ্জন মৈত্র ১৮
রাজুর জাগলিং শেখা–অভয় মিত্র ৫৮
বিজ্ঞানের খবর–সন্দীপ সেন ৪৭

বিশ্ববিচিত্রা □

জিজ্ঞাসা ২৩
জানা অজানা–অভিমন্যু ৯
অজানা পৃথিবী–অপরাজিতা ১৯
সত্যি! ৭০

কবিতা □

মিঠির চিঠি
–রূপক চট্টরাজ ৫

ছবিতে গল্প □

বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
–নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা ভোঁদা–নারায়ণ দেবনাথ ৭৬
বাহাদুর বেড়াল (রঙিন)
–নারায়ণ দেবনাথ ৫৯
বিলির বুট (রঙিন) ২৪
আলপসের তুষার রাজ্যে
ম্যাম'জেল এক্স ৬৬

বিভাগীয় লেখা □

খেলা–শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
–তুষার শীল ৪৫
দাদুমণির চিঠি ৪৮
তোমাদের পাতা ৪৯
মজার পাতা ৬৮
ছবিতে মজা
–মানব বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮

ঘোষণা □

পঞ্চানন গাঙ্গুলি স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৭৫
জানো কী ৪৩

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456(17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

দাম : টাঃ ৫.৫০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য–হাতে নিলে ৬৫ টাকা। ডাকে : বুক পোস্টে–৮০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে–১৪০ টাকা।

R. N. 1 Registration No. 2621/57

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

কারণ কমপ্লান ওদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়।

সাধারণত ১৫/১৬ বছর পর্যন্তই ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার বয়েস।

প্রোটিন হোল এমন এক পুষ্টিকর উপাদান, যা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দৈহিক গঠনে সরাসরি কাজ দেয়। তাই এখন থেকে আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যেও চাই কমপ্লান।

কমপ্লান-এ আছে সেরা প্রোটিন অর্থাৎ দুধের প্রোটিন (২০%)। এছাড়া আছে আরো ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ।

কমপ্লান বিভিন্ন মুখরোচক স্বাদগন্ধে পাওয়া যায়।

23

সুপরিকল্পিত মাত্রায়, ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান®

সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GX/62/234 BEN

শুকতারা

৪৩শ বর্ষ □ ৯ম সংখ্যা □ কার্ত্তিক ১৩৯৭/অক্টোবর ১৯৯০

মিঠির চিঠি

রূপক চট্টরাজ

"জানো বাপি, এবার শীতে
চিড়িয়াখানা গিয়ে
বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, হাতি
বাঁদর, হরিণ নিয়ে
অনেক ছবি রঙিন রঙিন
তুলব ক্যামেরায়
সারা দুপুর ঘুরব রোদে
মন যেখানে চায়।

চিড়িয়াখানা উঠে যাবে
শুনছি সোনারপুরে
সাইবেরিয়ার পাখিরা সব
আসবে কি আর উড়ে?
তাই তো ওদের বলব এসো
নতুন ঠিকানায়।"
ছোট্ট মিঠি লিখল চিঠি
নীল আকাশের গায়।।

কিচ্ছুটি আর বাদ দেব না
দেখব ঘুরে সব,
ঝিলের ধারে গুনব পাখি
শুনব কলরব।
ধমকাবে না সন্ধ্যে হলেও
টানবে না তো কান
পশুপক্ষীর সামনে যেন
হয় না অসম্মান।

ছবি: সুফি

হোইচির গল্প

শ্যামলী বসু

অনেক, অনেক দিন আগেকার কথা। জাপানের হনসু দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের ছোট্ট শহর শিমোনোসেকির আমিদাজি মন্দিরে থাকত হোইচি। বেচারা হোইচি, জন্ম থেকেই সে অন্ধ। চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু তার গলায় ছিল সুর। বড় মিঠে গলা ছিল তার। তারের বিওয়া যন্ত্র বাজিয়ে সে যখন গান করত,

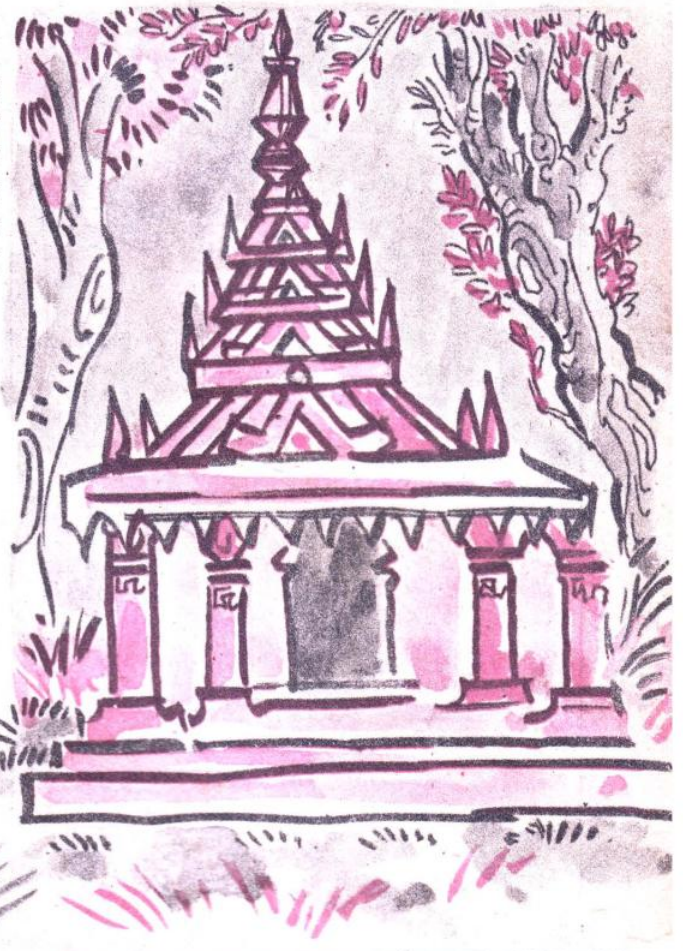

লোকে সব কাজ ফেলে অবাক হয়ে তার গান শুনত। আমিদাজি মন্দিরের প্রধান পূজারীর দয়ায় হোইচি মন্দিরে আশ্রয় পেয়েছিল।

আমিদাজি মন্দিরের একটা ইতিহাস আছে। হনসু আর কিয়ুসু দ্বীপের মাঝে শিমোনোসেকি প্রণালী। এইখানে একবার ক্ষমতার অধিকার নিয়ে জোর লড়াই হয়েছিল টাইরা আর মিশাকোটা গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে। সেই যুদ্ধ জাপানের লোককথায় দানৌরার যুদ্ধ নামে খ্যাত হয়ে আছে। দানৌরার নৌযুদ্ধে টাইরা গোষ্ঠীর লোকেরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার চাইতে মরা ভাল– এই কথা ভেবে টাইরা গোষ্ঠীর বীরেরা তাদের শিশু সম্রাট আনটোকুকে কোলে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আত্মহত্যা করে সম্রাটের মা আর ঠাকুরমাও। অপমৃত্যুর ফলে তাদের আত্মা শান্তি পায়নি। শিমোনোসেকি প্রণালীতে তাদের অতৃপ্ত আত্মা নানারকম ভৌতিক উপদ্রব করে বেড়াত। তাই তাদের আত্মার তৃপ্তির জন্য শিমোনোসেকি নগরে গড়ে উঠল বিরাট আমিদাজি মন্দির। মন্দিরের কাছে একটি সমাধিক্ষেত্র তৈরি করে সেখানে টাইরা যোদ্ধা আর রাজপরিবারের সকলের নামে স্মারকস্তম্ভ তৈরি করা হলো।

দানৌরার যুদ্ধে টাইরাদের বীরত্ব ও শোচনীয় পরাজয়ের কথা নিয়ে গান বেঁধেছিল হনসুর চারণকবিরা। তবে আমিদাজি মন্দিরের অন্ধগায়ক হোইচি এ ঘটনা নিয়ে সব-চাইতে ভাল গান গাইত। জাপানের চারপাশ থেকে যেসব লোক আসত মন্দির আর সমাধিক্ষেত্র দেখতে তারা হোইচির চারণ গান শুনত। শুনে খুব প্রশংসা করে যেত।

হোইচির দিনগুলো এমন করেই কেটে যাচ্ছিল। বিকেল হলে সে তার বিওয়া যন্ত্রটি হাতে করে এসে বসত মন্দিরের চাতালে। আপন মনে গান করে যেত।

একদিন সন্ধ্যার সময় মন্দিরের চাতালে বসে গুনগুন করে গান গাইছিল হোইচি। সেদিন মন্দিরের প্রধান পূজারী কি একটা জরুরী কাজে বাইরে গেছেন, অন্য পূজারীরা যে যার

কাজে ব্যস্ত। এমন সময় হোইচির কাছে এসে দাঁড়াল এক আগন্তুক। চোখে না দেখলেও কানে শুনে হোইচি বুঝতে পারল এ আগন্তুক কোনো সৈনিক পুরুষ হবে। কারণ বর্ম আর তলোয়ারের ঝনঝন শব্দ তার কানে গেছে।

আগন্তুক পুরুষটি গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'গায়ক হোইচি, আমি আসছি আমার প্রভু এক সামন্তরাজার কাছ থেকে। দানৌরার যুদ্ধের উপরে গাওয়া তোমার গানের সুখ্যাতি তাঁর কানে গেছে। আমার প্রভু এসেছেন এই অঞ্চলে দানৌরার যুদ্ধ যেখানে ঘটেছিল নিজের চোখে সেই জায়গাটা দেখবেন বলে। তোমার গানও শুনতে চান তিনি। তুমি আমার সংগে চল তাঁর কাছে।'

তার গানের খ্যাতি রাজারাজড়ার কানেও উঠে গেছে জেনে খুবই খুশি হলো হোইচি। সে সংগে সংগে তার তারের যন্ত্রটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার হাত ধরে অদেখা আগন্তুক তাকে নিয়ে চলল মন্দির থেকে সামন্তরাজার কাছে। ঠিক কোনদিকে, কতখানি গেল তা বুঝতে পারল না হোইচি। তবে সে বুঝতে পারল মস্ত একটা লোহার গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে তাকে একটা বিশাল সভার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। কারণ চারদিক থেকেই অনেক লোকের গলার স্বর, জামা-কাপড়ের খসখসানি আর অস্ত্রের ঝনঝনানি কানে ভেসে এল হোইচির।

একজন মহিলা যেন তার দিকে এগিয়ে এসে মিষ্টি গলায় বলে উঠলেন, 'এস, এস, হোইচি। তোমার গানের সুখ্যাতির কথা আমাদের কানে এসেছে। আজ তোমার গান শুনব আমরা। টাইরা যোদ্ধাদের বীরত্বের আর দানৌরা যুদ্ধের অমর কাহিনীর গান গেয়ে শোনাও আমাদের।' এই বলে মহিলাটি তাকে বসিয়ে দিলেন একটি পাথরের বেদীর উপরে।

এমন শ্রোতা পেয়ে, মন-প্রাণ ঢেলে গান শেষ করল হোইচি। অনেকক্ষণ ধরে গান গেয়েছিল সে। গান শেষ হতে চারদিক থেকে প্রশংসা কানে এল তার। গর্বে আনন্দে হোইচির মন ভরে উঠল। সেই মহিলাটিও মধুর গলায় বলে উঠলেন, 'হোইচি, তোমার গান শুনে আমরা খুবই খুশি হয়েছি। আমাদের রাজাও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। রাজা আরো কয়েকদিন এখানে থাকবেন। তাঁর ইচ্ছা এই ক'দিনই তুমি রোজ সন্ধ্যাবেলায় এসে আমাদের গান শুনিয়ে যাও। তুমি রাজী আছ তো?'

'এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।' আনন্দে গদগদ হয়ে বলে উঠল হোইচি।

'কিন্তু একটা শর্ত আছে।' বলে উঠলেন মহিলাটি, 'তুমি কাউকে বলতে পারবে না আমাদের কাছে এসে গান শোনানোর কথা। কারণ রাজা চান না, তাঁর এই অঞ্চলে থাকার কথা জানাজানি হয়ে যায়। তাহলে তিনি নিশ্চিন্তে শান্তিতে থাকতে পারবেন না এখানে।'

'ঠিক আছে। এ কথা আমি কাউকেই জানাব না।' বিনীতভাবে বলল হোইচি।

'কাল আবার সৈনিককে পাঠাব তোমাকে নিয়ে আসার জন্য। তুমি প্রস্তুত থেকো।' জানিয়ে দিলেন মহিলা।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় সৈনিকটি এসে আবার হোইচিকে নিয়ে গেল সামন্তরাজার সভায়। সেদিনও তার গান শুনে সকলে কত প্রশংসা করলেন।

'কাল আবার তোমাকে আনতে লোক পাঠাব', বলে দিলেন সেই মহিলা।

পরপর দুদিন সন্ধ্যায় হোইচি মন্দিরে যে নেই, এটা লক্ষ্য করেছিলেন এক পূজারী। তিনি প্রধান পূজারীকে জানিয়ে দিলেন সে কথা। অন্ধ গাইয়ে হোইচিকে প্রধান পূজারী খুবই ভালবাসতেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে হোইচিকে ডেকে বললেন, 'কি হয়েছে তোমার হোইচি। দুদিন সন্ধ্যায় তুমি মন্দিরে ছিলে না? তোমার শরীর ভাল আছে তো।'

হোইচি একটা এলোমেলো উত্তর দিল।

তুমি আমার সংগে চল তাঁর কাছে।

হোইচির দায়সারা উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না প্রধান পূজারী। তিনি সবাইকে ডেকে বলে দিলেন হোইচির উপরে যেন সবাই কড়া নজর রাখে। বেচারা অন্ধ হোইচি যেন কোনো বিপদে না পড়ে।

পরের দিন সন্ধ্যায় আবার সেই সৈনিকটি নিতে এল হোইচিকে। বিনা বাক্যব্যয়ে তারের যন্ত্রটি হাতে নিয়ে তাকে অনুসরণ করে মন্দির ছেড়ে চলে গেল হোইচি।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই প্রবল ঝড় জল শুরু হয়ে গেল। হোইচিকে মন্দিরে না দেখে অন্য পূজারী আর লোকজনদের ডেকে প্রধান পূজারী চললেন তার খোঁজ করতে। এই ঝড়জলে অন্ধ হোইচি কোথায় গেল?

সকলে লণ্ঠন নিয়ে খুঁজতে বেরোলেন হোইচিকে। খানিক খোঁজাখুঁজির পর হোইচিকে পাওয়া গেল আমদাজি মন্দিরের সমাধিক্ষেত্রে। টাইরা যোদ্ধাদের স্মারক সমাধিগুলোর কাছে, একমনে গান গেয়ে চলেছে সে। এত ঝড় বৃষ্টি,কোনোদিকেই হুঁশ নেই তার। আর তাকে ঘিরে জ্বলছে অদ্ভুত অপার্থিব আলো।

মন্দিরের লোকজনেরা তাকে জোর করে উঠিয়ে নিল সমাধি থেকে। বেজায় রেগে গিয়ে হাত পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ করতে লাগল হোইচি, 'কেন তোমরা আমাকে বিরক্ত করছ? এখানে কেন এসেছ তোমরা? জান না, রাজা ভীষণ রাগ করবেন?'

তাকে অনেক করে বুঝিয়ে সবাই মন্দিরে নিয়ে এল।

লোকজনের মুখে সব কথা শুনে প্রধান পূজারী চমকে উঠলেন। কি সর্বনাশ! টাইরা যোদ্ধাদের আত্মা তাড়া করে বেড়াচ্ছে বেচারা অন্ধ হোইচিকে। এবার হয়তো মারা পড়বে বেচারা।

হোইচির সংগে কথা বলে প্রধান পূজারী বুঝলেন, তাঁর অনুমান সত্যি। আর তাঁর মুখ থেকে সব কথা শুনে বেজায় ভয় পেয়ে গেল হোইচি। 'তাহলে কি হবে আমার? আবার যদি কাল ওরা নিতে আসে আমাকে।' কেঁদেই ফেলল সে।

'তোমার কোনো ভয় নেই', পূজারী হোইচিকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'তোমাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করব আমরা।

পরের দিন মন্দিরের এক পূজারীকে ডেকে প্রধান পূজারী বলে দিলেন –'হোইচির সারা শরীরে, মাথার চুল থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত, সব জায়গায় মন্ত্র পড়ে দিতে। তাহলে ভূতেরা আর হোইচিকে দেখতে পাবে না, কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না।' তারপর হোইচিকে ডেকে বলে দিলেন, 'দেখ হোইচি, মন্ত্র পড়ে দিলে তোমাকে আর আত্মারা দেখতে পাবে না। তুমি সন্ধ্যাবেলায় যেমন মন্দিরে বসে থাক, তেমনি বসে থাকবে। তোমাকে আত্মাদের কেউ ডাকতে এলে সাড়া দেবে না, কোনো শব্দও করবে না, তাহলে রেহাই পাবে তুমি।'

হোইচির সারা শরীরে মন্ত্র পড়ে দিলেন এক পূজারী। তারপর তারের যন্ত্রটা হাতে নিয়ে হোইচি বসে রইল মন্দিরের চাতালে। সন্ধ্যাবেলায়, তার কানে এল সেই ভূতুড়ে সৈনিকের পায়ের শব্দ। হোইচি শুনতে পেল তার নাম ধরে সে ডাকছে। 'হোইচি, কোথায় গেলে তুমি?'

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল হোইচি। সাড়াশব্দ দিল না। বার কয়েক ডাকাডাকি করে যখন কোনো সাড়া মিলল না, তখন সেই সৈনিকের আত্মা রেগে গিয়ে বলে উঠল, 'হোইচিকে দেখতে পাচ্ছি না, কেবল তার তারের যন্ত্রটা পড়ে আছে দেখতে পাচ্ছি। আর দেখতে পাচ্ছি হাওয়ার মধ্যে ভাসছে হোইচির দুটো কান। তাহলে এই কান দুটোই আমি আমার প্রভুর কাছে নিয়ে যাই। আমি যে হোইচিকে ডাকতে এসেছিলাম, এটাই হবে তার প্রমাণ।' এই কথা বলে সৈনিকের আত্মা হোইচির কান দুটো কেটে নিয়ে চলে গেল।

বেচারা অন্ধ গাইয়ে সব যন্ত্রণা সহ্য করল মুখ বুজে। ভয়ে কোনো শব্দ বেরোলো না মুখ দিয়ে। শেষে কানকাটার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মন্দিরের চাতালে।

মন্দিরের পূজারীরা আর লোকজনেরা এসে দেখতে পেলেন হোইচি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে মন্দিরের চাতালে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার মুখ। তার দুটি কানই কেটে নিয়ে গেছে যেন কেউ।

প্রধান পূজারী খুব বকলেন সেই পূজারীকে, যাকে তিনি হোইচির শরীরে মন্ত্র পড়ে দিতে বলেছিলেন। সেই পূজারী হোইচির সারা শরীরে মন্ত্র পড়ে দিলেও, দুটি কানে মন্ত্র পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই সৈনিকের আত্মা কেবল হোইচির কান দুটিই দেখতে পেয়েছিল। পূজারীর গাফিলতির জন্য কান দুটি হারাল বেচারী হোইচি।

অনেক সেবাযত্নের পর হোইচি সুস্থ হয়ে উঠল। তার ক্ষতও শুকিয়ে গেল। কিন্তু সেই থেকে লোকে আড়াল থেকে তাকে ডাকত 'কানকাটা হোইচি'।

ছবিঃ সুফি

প্রাচীন জাপানের গল্প

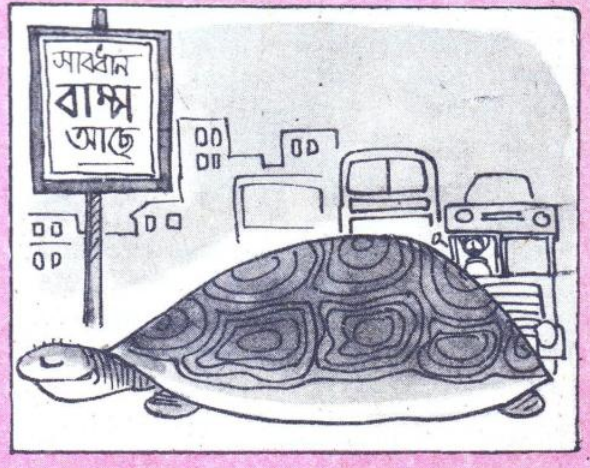

জানা-অজানা

অভিমন্যু

বাঁধাকপির অনেক গুণ

সম্প্রতি বাঁধাকপি নিয়ে গবেষণায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা অনেক রোগ নিরাময়ের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা জেনেছেন।

সারা দুনিয়ায় এমন কি উত্তর মেরু অঞ্চলেও বাঁধাকপির চাষ হয়। প্রাচীন রোমের ইতিহাসে বাঁধাকপির উল্লেখ আছে। বাঁধাকপির ল্যাটিন নাম কাপুট্ (caput)–মানে অনেক মাথা। বাঁধাকপি দিয়ে গৃহিণীরা অনেক সুস্বাদু তরকারি রাঁধেন। প্রাচীনকালে বাঁধাকপি শুধু খাদ্য নয়, ওষুধ হিসাবেও ব্যবহার করা হতো।

হিপোক্রেটিস, অ্যারিস্টটল ও প্লিনি বাঁধাকপির নিরাময় ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। মাথাধরা ও অনিদ্রায় রোমানরা বাঁধাকপি ব্যবহার করতেন। ক্ষতে রক্তপাত বন্ধের জন্যও বাঁধাকপির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বাঁধাকপির অনেক ভেষজ গুণের কথা সমর্থন করেন।

বাঁধাকপির মধ্যে এমন ভেষজ পদার্থ আছে যা মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও অকাল বার্ধক্য রোধ করে। আপেল, পীচ বা কলার চাইতে বেশি ভিটামিন 'সি' আছে বাঁধাকপিতে। আড়াইশো গ্রাম কাঁচা বাঁধাকপি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরের ভিটামিন 'সি'র চাহিদা মেটায়। বয়স বাড়ার সময় ও শিশুর শরীর বৃদ্ধির সময় বাঁধাকপি খুব উপকারী। বাঁধাকপির কিছু ভেষজ পদার্থ শিরার ভেতরের অবরোধ দৃঢ় করে ও গলব্লাডারে পাথর জমা বন্ধ করে। বাঁধাকপির কাঁচা সেলুলোজ রক্তের কোলেস্টরল দৃঢ় করে। বাঁধাকপি কার্বোহাইড্রেটের রূপান্তর বন্ধ করে। ফলে ডায়াবেটিস রোগীর পক্ষে খুব উপকারী। বাঁধাকপির সবুজ পাতা রক্তাল্পতায় দারুণ উপকারী।

হালফিল বাঁধাকপির ভেতর আর একটি মূল্যবান পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে যার নাম টারট্রোনিক অ্যাসিড, যা চিনি ও অন্যান্য কার্বোহাইড্রেটকে চর্বিতে রূপান্তরিত হতে বাধা দেয়। যাঁরা ওজন কমাতে চান তাঁদের পক্ষে বাঁধাকপি আদর্শ খাদ্য। রোজ বাঁধাকপির স্যালাডের ব্যবহার ওজন কমাতে সাহায্য করে। ১০০ গ্রাম বাঁধাকপিতে মাত্র ৩০ ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। অথচ ১০০ গ্রাম আটার রুটিতে আছে ২৪০ ক্যালোরি শক্তি।

১৯৫০ সালে চিকিৎসকেরা জেনেছেন বাঁধাকপি পাকস্থলী ও ডিওডিন্যাল ক্ষতের নিরাময় করে।

সম্প্রতি বাঁধাকপি থেকে বিজ্ঞানীরা একটি ক্ষত নিবারণী পদার্থ পৃথক করতে সমর্থ হয়েছেন যার নাম ভিটামিন 'ইউ'।

বিচিত্র উড়ন্ত কাঠবিড়ালী

দক্ষিণ ভারতে ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে এমন এক ধরনের কাঠ-বিড়ালী আছে যারা শুধু গাছের ডালে ডালে ছুটোছুটি করতে পারে তাই নয়, পাখির মতো ডানা মেলে উড়তেও পারে। এরা দেহের সামনের অংশের সঙ্গে পেছনের অংশ এমনভাবে টেনে ধরতে পারে যা দেখতে অনেকটা পাখির ডানার মতো। তখন এরা বাতাসে সাঁতার দিতে পারে।

উড়ন্ত কাঠবিড়ালীর দেহের লোম খুব ঘন, ল্যাজের গড়ন পালকের মতো। গাছের কাঠবিড়ালীর মতো এদের সামনের পায়ে চারটি নখ। চতুর্থ আঙুলটি সবচাইতে দীর্ঘ। পিছনের পায়ে পাঁচটি আঙুল। পায়ের নিচে লোম থাকে না। কানের পাশের লোম কালো। গায়ের ওপর দিকের রং লালচে-বাদামী। দুপাশের লোম কালচে। ল্যাজের মাঝ বরাবর একটা টানা কালো রেখা থাকে। পেটের দিকের লোম সাদা।

এই প্রজাতির কাঠবিড়ালী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে আসছে।

ছবিঃ রজতবরণ চক্রবর্তী

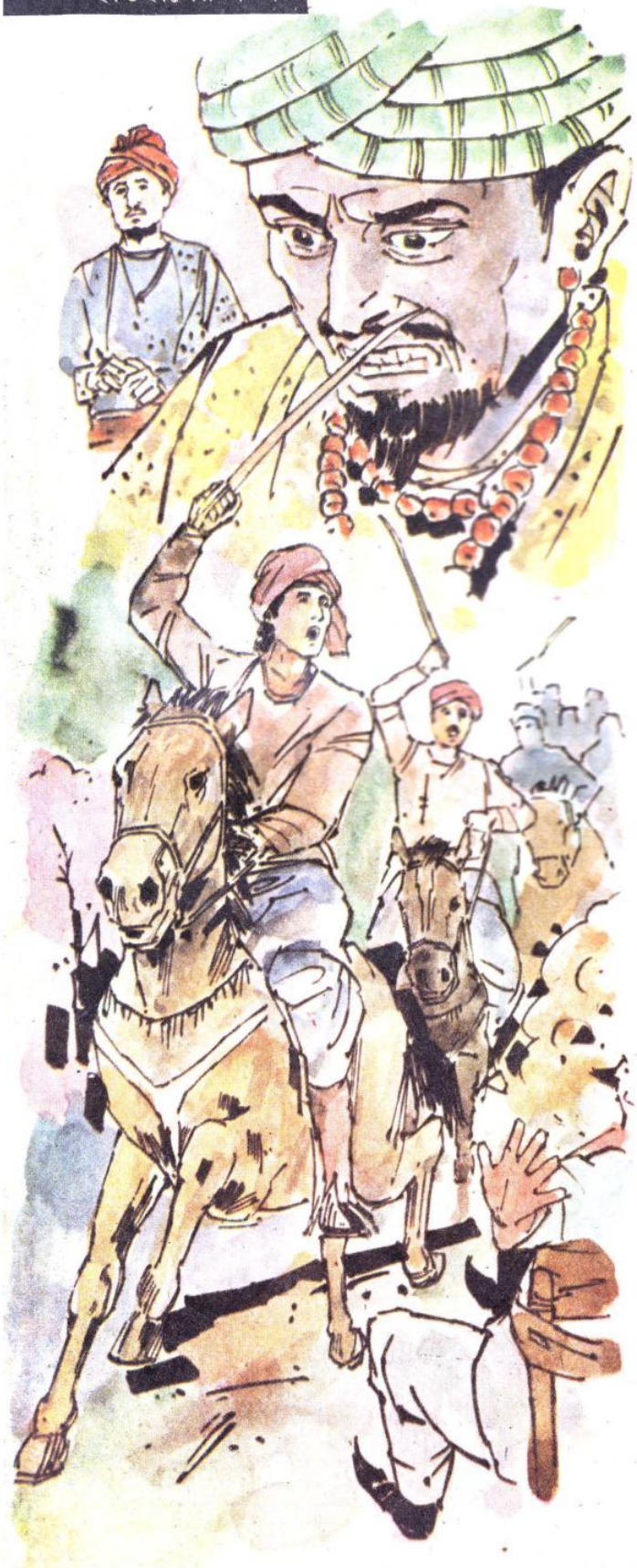

॥ এক ॥

যারা পরাজয় মানেনি

পঁয়ষট্টি হাজারের 'তুর্কী নাচ'

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

এ ঘটনাকে 'তুর্কী নাচ' ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে!

প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার আক্রমণকারী তুর্কী সেনাকে মাত্র হাজার কয়েক কলিঙ্গ-রাঢ়দেশী সৈনিক যেভাবে নাস্তানাবুদ কচুকাটা করেছিল, তাকে আর কোনো কিছুর সঙ্গে বুঝি তুলনা করা চলে না।

আর এই সেনাদলের নেতৃত্ব যিনি দিয়েছিলেন, তিনি এক অনামা বাঙালী সেনাধ্যক্ষ। তাঁর নাম লিখে রাখেনি ইতিহাস, তবে তাঁর গৌরব ও কীর্তির কথা আজও খুঁজে পাওয়া যাবে সমসাময়িক ঐতিহাসিকের বিবরণীর মধ্যে।

এ কাহিনীর সময়কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

এর কিছুকাল আগে তুর্কী সেনাধ্যক্ষ বখতিয়ার খলজী অতর্কিতে কৌশলে নবদ্বীপ অধিকার করেছে।

কিন্তু বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন রাজধানী ত্যাগ করে চলে গেলেও সেদিন তাঁর দেশপ্রেমিক সেনাদল এত সহজে পরাজয় স্বীকার করেনি। এই সেনাদলের এক অংশ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল দক্ষিণ বঙ্গে। সেদিন তারা শালিক্ষেত্রের বুকে বসে শপথ নিয়েছিল বিদেশী হানাদার তুর্কীদের বিরুদ্ধে আমরণ লড়াই-এর।

এরপর রাঢ়-বঙ্গের সেই সৈনিকেরা গিয়ে সহযোগিতা প্রার্থনা করে প্রতিবেশী উড়িষ্যারাজের। উড়িষ্যারাজ অনঙ্গ-ভীমদেব এই স্বদেশপ্রেমী যোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

ওদিকে তুর্কীরাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। তারা হাজারে হাজারে এসে আক্রমণ হানলো কলিঙ্গ সীমান্তে।

দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ সম্মিলিত কলিঙ্গ-রাঢ় বাহিনীর সঙ্গে তুর্কী সেনাদের যুদ্ধ চললো। তারপর একসময় কলিঙ্গ ও রাঢ়ী সেনাদল তুর্কী বাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল বীরভূমের পথে। দখল করলো শক্তিশালী নাগর দুর্গ। কিন্তু তবু যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলো না।

ইতিমধ্যে উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেছেন নরসিংহদেব। তিনিও রাঢ়ী বাহিনীকে পূর্বের মতোই সবরকম সাহায্য দিয়ে চললেন। কিন্তু শক্তিশালী তুর্কীদের সঙ্গে আর কতদিন চলবে এই অসম লড়াই!

এ সময়ে তুর্কী সেনাদলের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে স্বয়ং এলেন লখনৌতির তুর্কী সুলতান তুঘ্রাল তুঘান খাঁ। যেমন একগুঁয়ে তেমনি জবরদস্ত। বাঙালী আর কলিঙ্গ সেনাদের টিপে মারবার জন্যে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পঁয়ষট্টি হাজারেরও বেশি তুর্কী সেনা এনে জড় করলেন বীরভূমের লাল মাটিতে।

খবরটা রাঢ়-কলিঙ্গ সেনাদলের সেই অনামা অধিনায়কের কাছে পৌঁছতে দেরি হলো না।

আসছে....আসছে দুরন্ত মত্ত ঝটিকা–আর বুঝি রক্ষা নেই।

কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলেন না সেই অনামা বাঙালী সেনানায়ক। কেন বিচলিত হবেন–"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" মন্ত্রেই তো কয়েক হাজার দেশপ্রেমী সৈনিক একতাবদ্ধ হয়ে হাতিয়ার তুলে নিয়েছে শত্রুর বিরুদ্ধে।

তাই বলে কি সহজে প্রাণ দেবে?মৃত্যুর যোগ্য মূল্যে জয় করতে হবে জননী জন্মভূমির অধিকার।

কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব! পঁয়ষট্টি হাজার রণদক্ষ তুর্কী সেনার বিরুদ্ধে মাত্র হাজার কয়েক স্বদেশব্রতী সৈনিক! উড়িষ্যারাজ নরসিংহদেবের সহায়তা সত্ত্বেও এই বাহিনীর শক্তি কতটুকু!

তবু তা সম্ভব হয়েছিল। আর সেটাই আজকের কাহিনী।

এবার আমরা সে প্রসঙ্গেই ফিরে যাই।

।। দুই ।।

তুঘ্রাল খাঁর হুংকার

বটে! বটে। বল কি নজর খাঁ! ভেতো বাঙালী আর কলিঙ্গ যোদ্ধাদের লড়াই-এর সাধ তাহলে এতদিনে মিটেছে! আমার বিশাল তুর্কী বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখেই ব্যাটারা নেংটি ইঁদুরের মতো শিবির-টিবির তুলে পালাতে শুরু করেছে.....হাঃ.....হাঃ.....হাঃ.....!

বলতে বলতে হেসে যাকে বলে গড়িয়ে পড়েন লখনৌতির সুলতান তুঘ্রাল তুঘান খাঁ।

সিপাহশালার নজর খাঁ তবু যেন আমতা আমতা করে বলে, কিন্তু সুলতান, আমি ভাবছি, এত বছর ধরে যে সেনাদল আমাদের সঙ্গে সমানতালে লড়ে গেল, বীরভূম পর্যন্ত তেড়ে এসে গোটা কয়েক দুর্গ পর্যন্ত দখল করে নিল, হঠাৎ এমন কি ঘটলো.....

তুমি একটি গর্দভ, বুঝলে নজর খাঁ। এতদিন ওরা লড়াই করেছে তোমার মতো এলেবেলেদের সঙ্গে, এবার ওরা বুঝছে লড়াই কাকে বলে। বলতে বলতে তুর্কী সুলতান সামনের পাত্র থেকে এক খাবলা ঝলসানো গোস্ত তুলে সোজা চালান করে দেন নিজের মুখগহ্বরে, আরাম করে চিবুতে চিবুতে বলেন, তা ব্যাটারা কতদূর ভাগলো?

জী খোদাবন্দ, ওরা নাগর দুর্গ ছেড়ে অনেকটাই পেছিয়ে গেছে। এখন আশ্রয় নিয়েছে দক্ষিণ বীরভূম সীমান্তে সোনামুখির কাছে কাটাসিন দুর্গে।

কাটাসিন দুর্গ! শুনেই গোস্ত চিবুনো বন্ধ হয়ে যায় সুলতান তুঘ্রাল খাঁর, বলেন, দুর্গটা কেমন?

মোটামুটি দুর্ভেদ্য দুর্গ জাঁহাপনা।

শুনেই একটা রামধমক দেন সুলতান, যেমন করে হোক আগামী তিন দিনের মধ্যে ওই দুর্গ দখল করে বত্তেমিজগুলোকে টিপে মারা চাই। নৈলে–নৈলে তোমার শূলদন্ড।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের মুখের সমস্ত গোস্তের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে–সিপাহশালার দামী উর্দিটা নোংরার একশেষ হয়ে যায়। মনে মনে সুলতানের উদ্দেশে একটা অকথ্য গালাগাল দেয় নজর খাঁ, কিন্তু মুখে তা উচ্চারণ না করে একটা লম্বা তসলিম করে বলেন, জী খোদাবন্দ!

।। তিন ।।

গোপন পরিকল্পনা

এদিকে অনামা সেনানায়কের অধীনে প্রায় হাজার দুয়েক সৈনিক আশ্রয় নিয়েছে কাটাসিন দুর্গে।

সে দুর্গ অবরোধ করে বসে রয়েছে অগুন্তি তুর্কী সেনা।

রাঢ়ী গুপ্তচর খবর এনেছে তুর্কীরা সংখ্যায় পয়ষট্টি হাজারের কম নয়।

শুনে দুর্গকক্ষে পায়চারি করতে করতে ফিরে দাঁড়িয়েছেন রাঢ়ী সেনাধ্যক্ষ। বয়সে প্রবীণ, বহুযুদ্ধে অভিজ্ঞ, বৃষস্কন্ধ পুরুষটি এক দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁকে অস্বীকার করার সাহস কারুর নেই। এখন তাঁর সামনে উপবিষ্ট জনাকয়েক সেনাপ্রধান।

ধ্রুবদত্ত।

ধ্রুবদত্ত নামের সৈনিকটি উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে বলুন অধিনায়ক?

আমাদের পরিকল্পনা মতো সমস্ত প্রস্তুতি সারা হয়েছে তো?

সবাইকে বলে দাও আজকের দিনটা বিশ্রাম

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমাদের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি নেই ?

আজ্ঞে না। আপনি যেমন যেমন বলেছেন.....

বেশ। মনে থাকে যেন এ ব্যাপারে কোনোরকম বিচ্যুতি ঘটলে আমাদের এতদিনের সব লক্ষ্য এবং পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমরা চিরতরে হারাব মাতৃভূমির অধিকার।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন অধিনায়ক। ধ্রুবদত্ত এবার মাথা তুলে আত্মবিশ্বাসী স্বরে বললো।

তাহলে আর দেরি নয়। এখনই গুপ্তপথে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাও। আমাদের কুশলী মাহুত সর্দারকে জানিয়ে দাও দুর্গে দিবা দ্বিপ্রহরের ঘণ্টাধ্বনি হলেই.....

কথা শেষ হবার আগেই ধ্রুবদত্ত বললো, তাই হবে অধিনায়ক।

আর একবার অভিবাদন জানিয়ে দুর্গকক্ষ ত্যাগ করে ধ্রুবদত্ত।

অধিনায়ক এবার অন্য সেনাপ্রধানদের দিকে ফিরে তাকান। আগামী যুদ্ধের গোপন পরিকল্পনাটি নিয়ে আর একবার আলোচনা প্রয়োজন।

।। চার ।।

দীঘির জল টলটলে

এমন যুদ্ধ কার ভাল লাগে !

যে যুদ্ধে এসে এমন ঘনঘন হাই ওঠে আর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, তেমন লড়াই যে অন্ততঃ নজর খাঁর মতো সিপাহশালারের কাজ নয় তাতে কোনো ভুল নেই।

আসলে যেমন মাথামোটা সুলতান তুঘ্রাল খাঁ, তেমনি রামভীতু এদেশী সৈন্যগুলো। ব্যাটারা হঠাৎ যেন কেন যুদ্ধটুদ্ধ ছেড়ে এমন একটা দুর্গের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, কে জানে ! ভাবতে ভাবতে নজর খাঁ ঢুলতে শুরু করলো।

তবে দুর্গ যতই দুর্ভেদ্য হোক, পঁয়ষট্টি হাজার তুর্কী সৈন্যের পক্ষে তা দখল করা যে মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়, এ ব্যাপারে নজর খাঁর কোনো সন্দেহই নেই। আর তাই যদি হবে তবে অত তাড়াহুড়ো কিসের বাপু ! আজকের দিনটা একটু আরাম করে নিলে কি এমন ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ এই নিদারুণ গরমের দিনে কিছুকাল যাবৎ পঁয়ষট্টি হাজার তুর্কী সৈন্য ভারী ভারী হাতিয়ার নিয়ে শুধু ছুটেই বেড়াচ্ছে। না গোসল, না ভালভাবে খানাপিনা..... !

আঃ.....ভাবতে ভাবতেই কোথা থেকে এক ঝলক বাতাস এসে শরীরটাকে যেন জুড়িয়ে দিল নজর খাঁর। এ জায়গাটার সত্যিই কেমন একটা মায়া আছে। বীরভূমের রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে জায়গাটা ব্যতিক্রম। শিবিরের পাশেই রয়েছে একটা বিশাল টলটলে দীঘি। আশপাশে নানা ফলফুলের গাছ। দীঘির ওপর থেকে ঠান্ডা বাতাস বয়ে আনে আমেজ ভরা মাদকতা।

কাসেম আলি এসে সামনে দাঁড়ালো, জনাব, দিবা দ্বিপ্রহর হতে চললো। শত্রুর কোনো সাড়াশব্দ নেই। ফৌজ আজকের দিনটা বিশ্রাম চাইছে.....

মঞ্জুর ! মঞ্জুর ! সহঅধিনায়ক কাসেম আলির কথা শেষ হবার আগেই নজর খাঁ আধবোজা চোখে বলে উঠলো, সবাইকে বলে দাও আজকের দিনটা বিশ্রাম। সুলতানকে আমি বুঝিয়ে বলব। তবে আগামীকাল ভোরেই দুর্গ আক্রমণ করে লড়াই ফতে করতে হবে।

কাসেম আলি খুশিমনে নির্দেশ নিয়ে চলে গেল। পঁয়ষট্টি হাজার তুর্কী সৈনিককে আজ ওই দীঘির জল যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আর একজনের কাছেও এ খবর তড়িৎগতিতে পৌঁছে গেল–তিনি সেই অনামা রাঢ়ী অধিনায়ক। এই অবকাশটুকুই তিনি চেয়েছিলেন।

।। পাঁচ ।।

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা

দিবা দ্বিপ্রহর বেলায় পঁয়ষট্টি হাজার তুর্কী ফৌজের অধিকাংশই তখন হাতিয়ার বন্ধ করে সামরিক উর্দি খুলে স্নান-আহারে ব্যস্ত।

এই আগুনঝরা বৈশাখের দিনগুলিতে ক্রমাগত ছুটতে ছুটতে ওরা সত্যিই কাহিল হয়ে পড়েছিল। আজ সিপাহশালার নজর খাঁ আর কাসেম আলির দয়ায় ফুরসৎ পেয়ে ওরা সেই বিরাট কাকচক্ষু দীঘির সুশীতল জলে আনন্দে কোলাহল করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে নজর খাঁ কাসেম আলি তো আছেই–স্বয়ং সুলতানও বাদ নেই।

যাদের স্নান শেষ হয়েছে তারা ব্যস্ত রয়েছে খানা পাকাতে। মাত্র কিছু সৈনিক বিরস বদনে শিবির পাহারায় ব্যস্ত। কিন্তু তারাও উর্দি আলগা করে উন্মুখ হয়ে রয়েছে কখন সঙ্গীরা এসে তাদের জায়গা নেবে। তারপর তারাও সেই শীতল দীঘিতে গিয়ে শরীর মন জুড়োবে।

টুপি খুলে হাওয়া খেতে খেতে তুর্কীরা এদেশী সৈন্যদের কাপুরুষতার রসালো গল্পই করছিল।

একটু দূরে জঙ্গলের কাছাকাছি যুদ্ধের হাতিগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। সংখ্যায় শ' পাঁচেক তো বটেই। যেমন জঙ্গী, তেমনি বিশাল তাদের আকার। আগামীকাল দুর্গ জয় করতে এই রণহস্তীগুলি বিশেষ কাজ দেবে।

নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওদের একজনের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হলো। আর তারপরই থমকে গিয়ে আপনা থেকেই মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, আরে। ই ক্যায়া তাজ্জব !

অপর সঙ্গীও ফিরে তাকায়। তার চোখ দুটোও বড় হয়ে ওঠে। চোখে ওরা ভুল দেখছে না তো !

সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার ! শিবিরের প্রান্তে বাঁধা হাতিগুলো যেন কোনো জাদুমন্ত্রের ঘোরে তাদের বাঁধন খুলে জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে।

অবশ্য একটু তাকিয়ে থাকতেই রহস্যটা টের পাওয়া গেল–হাতিগুলির বাঁধন খুলে তাদের পোষ মানিয়ে নিয়ে চলেছে কালোকোলো চেহারা আদুড় গা কিছু মানুষ। ওরা সব দক্ষ মাহুত বলেই বোধ হলো।

কখন যে ওরা চুপিসাড়ে হাতির পালের মধ্যে ঢুকেছে এবং

তুর্কীপক্ষের যে কজন প্রহরী এবং মাহুত ছিল, তাদের পেছন থেকে কায়দা করে মেরেছে অথবা বন্দী করে ফেলেছে কেউই টের পায়নি। এখন ওরা নিঃশব্দে হাতিগুলোকে নিয়ে চলেছে জঙ্গলের দিকে।

বিস্ময় কাটিয়ে এবার শিবিররক্ষীরা চিৎকার শুরু করলো, আরে দুশমন.....দুশমন.....হাতি পালাচ্ছে.....হাতি..... হাতি.....!

তাদের এই চিৎকার দীঘির জলে স্নান এবং খানাপিনায় রত তুর্কী সেনাদলের কাছে পৌছলো কিনা কে জানে, কিন্তু তার আগেই দেখা গেল পাশের জঙ্গলে ঝড় উঠেছে। হাতে খোলা তলোয়ার, ভল্ল, তীরধনু নিয়ে ছুটে আসছে একদল রাঢ়ী আর কলিঙ্গদেশী সেনা। তাদের সঙ্গে কিছু সশস্ত্র অশ্বারোহী।

এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য তুর্কী শিবিরে কেউই প্রস্তুত ছিল না।

কে ভেবেছিল যে সৈনিকেরা সুদূর নাগর থেকে পিছু হটতে হটতে এসে কাটাসিন দুর্গে আশ্রয় নিয়ে এমন সুচতুর পরিকল্পনায় পাল্টা আক্রমণ শুরু করবে?

যাকে বলে মরণপণ জেদ। বীরভূমের জঙ্গল থেকে যে পদাতিক আর অশ্বারোহীরা ঝটিকার বেগে বেরিয়ে এসে তুর্কী শিবিরে ঝাঁপিয়ে পড়লো, সংখ্যায় তারা মোটে আড়াইশোর বেশি নয়, কিন্তু ওরা সবাই সংঘবদ্ধ সুদক্ষ যোদ্ধা। অপরপক্ষে তুর্কীরা তখন শুধু নিরস্ত্রই নয়, যারা দীঘির জলে স্নান করছিল তারা তো প্রায় বিবস্ত্রই বলা চলে। এদের মধ্যে সিপাহশালার নজর খাঁ, কাসেম আলি তো আছেই, স্বয়ং সুলতানও রয়েছেন।

এই অবস্থায় আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়লো সেই পঁয়ষট্টি হাজার তুর্কী সৈনিক। পড়ে রইলো অস্ত্রশস্ত্র, তৈরি খাবার– এখন শুধু চাচা আপন প্রাণ বাঁচা.....

দে দৌড়–দে দৌড়!। সেই পঁয়ষট্টি হাজার নিরস্ত্র তুর্কী সেনা যে যেমন অবস্থায় ছিল রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে চললো দিগ্‌বিদিকহারা হয়ে।

অবশ্য এখন আর শুধু কয়েকশো নয়, ছত্রভঙ্গ শত্রু পালাতে শুরু করলে কাটাসিন দুর্গের দ্বার খুলে বেরিয়ে এল কয়েক হাজার সম্মিলিত রাঢ় কলিঙ্গদেশী সৈনিক। ভীমবেগে আক্রমণ করলো তারা।

তুর্কীরা তখন চোখে সর্ষেফুল দেখতে শুরু করেছে। সুলতান তুঘ্রাল খাঁ তাঁর সিপাহশালারকে হাঁপাতে হাঁপাতে শুধু বললেন, লখনৌতি, লখনৌতি চল। নইলে আমরা সবাই মরব এই ধূর্ত বাঙালীদের হাতে।

ভীত-বিহ্বল তুর্কীরা পালাতে শুরু করলো লখনৌতির পথ ধরে।

কিন্তু সে পথও কণ্টকশূন্য নয়। অনামা সেনাধ্যক্ষ আগে থেকেই এখানে রচনা করে রেখেছিলেন তাঁর পরিকল্পনার পরবর্তী মৃত্যুব্যূহ।

সে ঘটনাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

॥ ছয় ॥

পরিকল্পনার শেষ পর্ব

হয়েছে কি, লখনৌতি যাবার পথের ধারে এবং গ্রামগুলিতে আগে থেকেই রাঢ়ী সেনানায়ক মজুত করে রেখেছিলেন বেশ কিছু কুশলী সৈনিক। তারা কেউ চাষী, কেউ কামার অথবা অন্য কোনো নিরীহ গ্রামবাসীর ছদ্মবেশে লুকিয়েছিল।

পলায়নপর তুর্কী সেনাদল এসে পড়তেই এবার তারাও ছোট ছোট দলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো বিদেশী দখলদার বাহিনীর ওপর।

তুর্কীদের অবস্থা এখন বলাই বাহুল্য। পেছনেও তেড়ে আসছে সশস্ত্র সৈনিক। চতুর্দিক থেকে আক্রমণে তারা যাকে বলে কচুকাটা হতে লাগলো।

পঁয়ষট্টি হাজার তুর্কী সৈন্যের মধ্যে মাত্র জনাকয়েককে নিয়ে সুলতান তুঘ্রাল তুঘান খাঁ ফিরে গেলেন রাজধানী লখনৌতিতে।

এমন 'তুর্কী নাচে'র পর খাঁ সাহেবের যুদ্ধের নেশা তখন একেবারে মিটে গেছে।

উপসংহার

আমাদের কাহিনীও এখানেই শেষ

আমাদের কাহিনীও এখানেই শেষ।

এইভাবেই বখতিয়ার খলজীর অতর্কিত কৌশলে নবদ্বীপ জয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল একদল কলিঙ্গ-রাঢ়দেশী সৈনিক বীরভূমের প্রান্তরে এক অনাম বাঙালী সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে। সেই সেনা-অধিনায়কের নাম লিখে রাখেনি বাঙালীর ইতিহাস, তবে পঁয়ষট্টি হাজার তুর্কী সেনার এই শোচনীয় পরাজয় এবং বাঙালী ও কলিঙ্গবাসীদের শৌর্যবীর্য, রণচাতুর্যের গৌরবগাথার সূত্র পাওয়া গেছে এক তুর্কী পক্ষেরই ঐতিহাসিকের স্বচক্ষে দেখা বিবরণী থেকে। তিনি মিনহাজ-উস-সিরাজ।

কাটাসিন দুর্গের লড়াইয়ের তারিখটা ছিল ১৬ই এপ্রিল, ১২৪৪ খ্রীস্টাব্দ। শনিবার।

ছবিঃ বিজন কর্মকার

মুখোপাধ্যায় ● মান্না ● দত্ত
উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান
(হায়ার সেকেন্ডারী ● জয়েন্ট এন্ট্রান্স ● সর্বভারতীয় বায়োলজী পরীক্ষার্থীদের জন্য যুগোপযোগী গ্রন্থ)

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ● বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
(প্রশ্নোত্তরে)
সংসদের নমুনা প্রশ্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসা প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত নমুনা কপি না পেয়ে থাকলে সরাসরি লিখুন

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রবিদাস সাহারায়

॥ চার ॥

টমকে অনুসরণ করে সত্যি লাভ হলো। পাওয়া গেল পথ। দু' চারটা ঝোপ পেরিয়ে এসে অরুণেরা দেখতে পেল তাদের নৌকাটি আগের জায়গাতেই রয়েছে। মনের অবসাদ মুহূর্তে কেটে গিয়ে সবার মুখেই হাসি ফুটে উঠল। স্বপন বলল, রক্ষা টম সংগে ছিল।

কিন্তু সমুদ্রে কি ঢেউ। এত ঢেউ তো ছিল না। এত হাওয়াও ছিল না আগে। সামান্য কনুই-ডোবা জলে নৌকা তুলে রেখেছিল তারা। কিন্তু এখন সেখানে জল থৈ থৈ করছে। একটু দেরি করলেই হয়তো নৌকা ভেসে চলে যেত।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তারা নৌকায় উঠে পড়ল। ঠেলবার দরকার হলো না। তারা উঠে বসতেই নৌকাটি নড়ে উঠল। দুলতে লাগল ভয়ানকভাবে। ঢেউ এসে ভেঙে পড়তে লাগল নৌকার ওপর।

সবাই বৈঠা হাতে নিল। কিন্তু বেশিদূর তারা এগোতে পারল না। সমুদ্রের ঢেউগুলো হঠাৎ আরও উত্তাল হয়ে উঠল। বাতাস হয়ে উঠল আরও চঞ্চল। মনে হলো নৌকাটা এখনই উলটে যাবে।

ঢেউয়ের ঝাপটায় ভিজে নেয়ে উঠল সকলে। টম ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে ওঠে। এই ঠাট্টাটা যেন তার মোটেই ভাল লাগছিল না।

প্রকৃতি যে এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে তা কে জানত? বাতাসের বেগ ক্রমশ হয়ে উঠল ভয়ংকর। তার সংগে বৃষ্টি। সমুদ্রের সেকি ভীষণ রূপ!

হঠাৎ বিরাট একটা ঢেউ এসে নৌকাটা উলটিয়ে দিল। কোথায় ভেসে গেল কলাগুলি, কোথায় ছিটকে গেল হাতের বৈঠা। সবাই জলে হাবুডুবু খেতে লাগল। অথৈ জলে তখনও নৌকা যায়নি তাই রক্ষা। ঝাঁপাঝাঁপি করে সবাই পাড়ের দিকে ছুটে আসতে লাগল।

স্বপন চেঁচিয়ে উঠল—ঐ যে একটা বৈঠা ভেসে যাচ্ছে।

বরুণ চেঁচিয়ে উঠল—ঐ যে আর একটা।

সুভাষ ও অরুণ দু'জনে ছুটে গিয়েও বৈঠা দুটো ধরতে পারল না। এমন সময় দেখা গেল নৌকাটাও ভেসে যাচ্ছে। সুভাষ সাঁতরিয়ে গেল নৌকাটি ধরতে। কিন্তু সেটা ততক্ষণে তার নাগালের বাইরে। একটা বড় ঢেউ এসে সুভাষের চোখেমুখে লাগল। নৌকাটাও গেল ঢেউয়ের আড়াল হয়ে।

ঝড়বৃষ্টির বেগ তখন আরও বেড়ে চলেছে।

নৌকাটা হারিয়েই গেল!

নিরুপায় হয়ে সকলে ফিরে চলল পাড়ের দিকে। কি তাদের ভাগ্যে আছে কে জানে!

এদিকে বেলা শেষ হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকার নেমে আসবে এই অজানা নির্জন দ্বীপের ওপর। কোথায় তারা আশ্রয় নেবে? থাকবার মধ্যে আছে শুধু ঐ একখানা ভাঙা বাড়ি—রড়া দ্বীপের একটিমাত্র কুঠী। সেই দিকেই তারা চলল।

সুভাষের কাঁধে যে ঝোলা ছিল—রক্ষা সেই ঝোলাটা জলে ভেসে যায়নি। তবে ভিতরের সবকিছু ভিজে গেছে। কাগজপত্র, এমন কি টর্চ লাইটটা পর্যন্ত। অরুণের ঝোলায় অবশ্য টুকিটাকি জিনিস ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না। সেগুলোর বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি।

কুঠীর বারান্দায় পা দিয়ে তবু একটু নিশ্চিন্ত হলো তারা। ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে তো বাঁচা গেল।

বারান্দায় একটু আলো থাকলেও ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। সুভাষ ঝোলা থেকে টর্চ লাইট বের করল। জলে ভিজলেও টর্চের কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু কাগজগুলো ভিজে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলো বের করে বাইরে রেখে দিল। টর্চ জ্বেলে ঘরের ভিতরটা দেখে নিল সুভাষ। সামনের

দিকটা পরিষ্কার। কোনোরকমে সেখানে রাত কাটান চলবে।

পোশাক সবারই ভেজা। জামা খুলে নিংড়ে নিল সবাই। সুভাষের সাঁতারের পোশাকটা এক এক করে পরে প্যান্টও নিংড়ে নিল। রক্ষা শীতকাল নয়, নইলে কি যে কষ্ট হতো!

ঝড় কখন থেমে গেছে–কেউ জানে না। অবসন্ন হয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে মাঝরাত্রে। ঘুম যখন ভাঙল তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। সূর্য উঠেছে পুবদিক রাঙিয়ে।

সবাই উঠে পড়ল। বেরিয়ে পড়ল বাইরে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভরে উঠল সকলের মন। কি সুন্দর প্রভাত!

কিন্তু নিজেদের অবস্থার কথা ভেবে তখনই আবার মন ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। এই অচেনা অজানা দ্বীপে তারা অসহায় বন্দী বললেই চলে, যদি নৌকাটি খুঁজে পায় তবেই তারা ফিরে যেতে পারবে। নইলে তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে কে জানে!

সবাই মিলে নৌকা খুঁজতে বের হলো। আজ সমুদ্রতীরের সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে কোনো অসুবিধা হলো না। কিন্তু গিয়ে দেখল তাদের নৌকার কোনো চিহ্নই নেই।

স্বপন জিজ্ঞেস করল–তাহলে কি হবে অরুণদা?

অরুণ জবাব দিল–দেখা যাক কি হয়।

স্বপন বলল–বড্ড খিদে পেয়েছে। চলো না সেই কলাবাগানে। কলা তো অনেক আছে।

অরুণ বলল–ঠিক বলেছিস। তাই চল। কলা ছাড়া ভাগ্যে আর কিছু নেই!

সবাই মিলে আবার সেই কুঠীঘরের কাছে এসে পৌঁছল। বারান্দা ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল সেই কলাবাগানের সামনে। কিন্তু কোথায় সেই বাগান? ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছে সব। দু'একটা গাছ কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। আর সব শুয়ে আছে মাটিতে।

বরুণ বলল–ইস্, কাল কতগুলো কলা ছিল! সেগুলো থাকলে আজ খাওয়া যেত।

অরুণ বলল–চল্ বাগান খুঁজে দেখি, কিছু পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

এদিক ওদিক ঘুরে অনেক খোঁজা হলো, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। যেভাবে গাছগুলি পড়ে আছে তাতে খুঁজে দেখাও সহজ ব্যাপার নয়।

অসহায়ের মতো সবাই দাঁড়িয়ে রইল।

সবাই পরিশ্রান্ত। খোঁজার ধৈর্য আর কারুর নেই।

এমন সময় হঠাৎ বরুণ চেঁচিয়ে উঠল–ঐ দেখো, কি যেন দেখা যাচ্ছে।

কথা শুনে সবাই তার দিকে তাকাল। বরুণ আঙুল দিয়ে যেন দেখাল–ঐ দ্যাখো–

ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সবাই তাকিয়ে দেখল–জাহাজের মতো কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে।

জাহাজ! জাহাজ এল কোত্থেকে? এই ভোরবেলাতেই নতুন কোনো জাহাজ এসে রডা দ্বীপে পৌঁছল নাকি?

সবার মনই অদম্য কৌতূহলে ভরে উঠল। সবাই ছুটল সেই দিকে। খিদের কথা যেন তারা একেবারেই ভুলে গেল।

এ কি! এটা তো নতুন কোনো জাহাজ নয়। কোনো চালক নেই, কোনো আরোহী নেই। দেখতে কেমন যেন ছন্নছাড়া। এটা কোন জাহাজ? ঝড়ের দাপটে সমুদ্রের জল তোলপাড় হয়ে সেই ডুবে যাওয়া জাহাজটি ভেসে ওঠেনি তো?

সুভাষ বলল–এটা নিশ্চয়ই সেই জাহাজ, যে জাহাজ কাল জলের তলায় দেখে এসেছি।

অরুণ বলল–ঝড় তাহলে আমাদের উপকারই করেছে। এ-জন্যই হয়তো আমাদের ফিরে যাওয়া আর হয়নি। দেখা যাক্ ভাগ্যে কি আছে।

সুভাষ বলল–ঐ জাহাজের ভেতর আমাদের যেতে হবে। দেখব কি আছে এর ভেতরে। কাল তো ভিতরে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

–কিন্তু আজই কি করে সম্ভব? অরুণ বলল–জাহাজটা আছে বেশ কিছু দূরে। আমাদের নৌকাটা থাকলেও না হয় তাতে করে জাহাজের কাছে যাওয়া যেত।

সুভাষ বলল–নৌকা যখন নেই তখন সাঁতরিয়েই যেতে হবে। তারপর দেখতে হবে কোনোভাবে জাহাজে ওঠা যায় কিনা।

জল থেকে জাহাজের ডেকটা যে অনেক উঁচু। কিভাবে উঠবে?–জিজ্ঞেস করল বরুণ।

সুভাষ বলল–সেটা পরে দেখা যাবে। আগে তো জাহাজের কাছে যাই। তোমরা কেউ যেতে সাহস না করো, আমি একাই যাব।

সুভাষ সাঁতারের পোশাক পরল। কিন্তু একটা মাত্র সাঁতারের পোশাক। তাই বলে কি আর সবাই পিছিয়ে থাকবে? না, তা হয় না। অরুণ বলল–আমি এই পোশাকেই যাব।

বরুণ বলল–আমিও যাব।

স্বপন বলল–আমিও যাব। সাঁতার আমিও জানি।

বাকী রইল টম। সবার কথা শুনে ঘেউ ঘেউ করে উঠল টম। অর্থাৎ বলতে চাইল–আমিও তোমাদের সঙ্গী। আমিই বা কেন একা পড়ে থাকব?

সমস্যা হলো অরুণ আর সুভাষের ঝোলা দুটি নিয়ে। ওগুলো ভিজলে ক্ষতি হবে! দুটো টর্চ আছে দু'জনের ঝোলায়। জাহাজের ভেতর ঢুকতে হলে টর্চের খুবই দরকার। কিছুতেই ওগুলো রেখে যাওয়া চলে না। তখন সুভাষ আর অরুণ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তাদের ঝোলা দুটোকে তাদের মাথায় পাগড়ির মতো করে বাঁধল।

এবার শুরু হলো তাদের অভিযান। যতটা হেঁটে যাওয়া যায়, জল ভেঙে হেঁটে গেল তারা। তারপর সাঁতার কেটে জাহাজের কাছে গিয়ে পৌঁছল। অবশ্য বেশি পথ তাদের সাঁতার কাটতে হলো না। টমও অনায়াসেই জাহাজের কাছে গিয়ে পৌঁছল।

জাহাজের কাছে এসে তারা দিশেহারা। উপরে উঠবার

কোনো সুবিধাই নেই। হাতে ধরবার বা পা রাখবার কিছু থাকলে কোনোরকমে ওঠা যেত। এখন ডুবো নৌকার যাত্রীর মতো এদিক থেকে ওদিকে যাওয়া ছড়া কোনো উপায় নেই।

জাহাজটা খুব বড় নয়। কাজেই চারদিক ঘুরে আসতে খুব অসুবিধা হলো না। আর ঘুরতে গিয়ে একটা মস্তবড় লাভ হয়ে গেল। দেখা গেল একটা মোটা কাছি জাহাজের গা বেয়ে ঝুলছে।

সুভাষ সেই কাছি ধরে উপরে উঠে গেল। তারপর সবাইকে বলল—এটা ধরে তোমরা একজন একজন করে উপরে উঠে এসো।

এবার উঠল অরুণ। তার উঠতে খুব কষ্ট হলো না। কারণ, নোঙর বাঁধার খুঁটির সঙ্গে জড়ানো ঐ কাছি বেয়ে উঠতে সুভাষও তাকে কিছুটা সাহায্য করল। এরপর উঠল বরুণ আর স্বপন। বাকী রইল টম। সবাই উঠে যাচ্ছে দেখে তার কি আকুলি-বিকুলি। সুভাষ ওদিকে আর একটা মোটা দড়ি খুঁজে পেয়েছে। সেটা একদিকে ফাঁসের মতো তৈরি করে ফেলে দিল নিচের দিকে। দু'তিনবার চেষ্টা করার পরই সেই ফাঁসটা টমের গলায় ও সামনের দু'পায়ে গলে গেল। তারপর তাকে টেনে তুলতে আর বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

জাহাজে উঠতে পেরে সবার মুখে হাসি ফুটল। খিদের কথা ভুলে গেছে তারা আগেই। সফলতার প্রথম ধাপে উঠে উল্লাসে তাদের মন ভরে উঠল।

জাহাজটা জলের তলায় কতদিন ছিল কে জানে? শেওলা জমে পেছল হয়ে গেছে সারাটা ডেক। কেবিনের দরজা-জানলা জল-কাদায় একাকার হয়ে গেছে।

মোট তিনটে কেবিন আছে জাহাজে। তার মধ্যে একটি খোলা আর দুটি বন্ধ। খোলা কেবিনে তারা গিয়ে ঢুকল। ভিতরে কি জিনিস আছে সহজে বোঝা যায় না। সুভাষ টর্চ জ্বালতে তবু কিছুটা দেখা গেল। এক কোণে জড়ো করা আছে কতগুলো কাঠের টুকরো আর লোহার যন্ত্রপাতি।

অরুণ আর সুভাষ সেগুলি নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। ওসবের মধ্যে রয়েছে দুটি শাবল, একটি কোদাল, একটি কুড়োল আর কয়েকটি লোহার রড। কোদাল, কুড়োল আর শাবল দুটি তারা বেছে নিল। ওগুলি কাজে লাগবে। ঘরের আর এক কোণে টর্চের আলো ফেলতেই দেখা গেল সেখানে জড়ো করা রয়েছে মোটা মোটা কাছি।

অরুণ বলল—এই কাছিগুলি আমরা নিয়ে যাব। এগুলি হয়তো অনেক কাজে লাগবে।

পাশের কেবিনটার দরজায় তালা লাগান। চাবি ছাড়া তালা খোলা সম্ভব নয়। সুভাষ লোহার শাবল দিয়ে তালাটা ভেঙে ফেলল।

কেবিনে জল থৈ থৈ করছে। দরজাটা খুলতেই কিছু জল গলগল করে বেরিয়ে এল। সুভাষ টর্চ জ্বালিয়ে দেখল ভিতরে রয়েছে কয়েকটি পিপে ও মুখ বন্ধ করা দুটো টিন। এলোমেলোভাবে সেগুলো কেবিনের মেঝেতে ছড়িয়ে আছে।

সন্তর্পণে পা ফেলে তারা কেবিনের ভেতর ঢুকল। দেখতে লাগল খুঁটিনাটি অনেক কিছু জিনিস।

স্বপন বলল—ঐ মুখবন্ধ টিনদুটো খুলে দেখ না।

টিন দুটো নিয়ে আসা হলো বাইরে।

সুভাষ তখনই খুলতে লেগে গেল। কুড়োলের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ চাড় দিতেই আলগা হয়ে গেল টিনের মুখে। প্রথম টিনটা খুলে ভিতরে যা পাওয়া গেল তা কেউ আশা করেনি! টিন ভরতি বিস্কুট।

—বিস্কুট! বিস্কুট! সবার মনে কি আনন্দ!

বরুণ বলল—সুভাষদা, আমাকে বিস্কুট দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে।

ওই দ্যাখো, কি যেন দেখা যাচ্ছে।

স্বপন বলল–আমাকে দাও।

সুভাষ বিস্কুট তুলে সবার হাতে দিল। নিজের মুখে পুরতে পুরতে টমের সামনেও ছুঁড়ে দিল কয়েকটা।

কি সুন্দর মুচমুচে বিস্কুট। জলের নিচে থেকেও যে এমন মুচমুচে আছে সেটাই আশ্চর্য।

অরুণ বলল–আমাদের জন্যই হয়তো এগুলো ছিল।

আরও একটি টিন রয়েছে ঠিক ঐরকম। বুঝতে পারা গেল ওতেও বিস্কুট আছে। জাহাজের লোকদের জন্যই এসব আনা হয়েছিল, কিন্তু সব খাওয়া তাদের হয়ে ওঠেনি।

কোথায় গেল আরোহীরা? এই জাহাজের খোঁজখবরও কেউ করল না কেন? সবকিছুই যেন রহস্যে ঢাকা রইল।

অরুণ বলল–চল্, খুঁজে দেখি। আরও দরকারী জিনিস হয়তো পাওয়া যাবে।

সেই কেবিন খোঁজা শেষ হলো। এখন বাকী শুধু আর একটি কেবিন। ঐ কেবিনে আরো কত কি আছে কে জানে?

বন্ধ কেবিনের সামনে গিয়ে সবাই দাঁড়াল। দরজায় তালা দেওয়া নেই। জোরে ঠেলতে লাগল সবাই মিলে। কিছুক্ষণ ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

ফাঁকা কেবিন, জিনিসপত্র কিছু নেই। জল-কাদার মধ্যে টেবিল ও চেয়ার ওলটানো। একজোড়া কাপ ডিশ ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। পড়ে আছে একটা জেলির মুখ খোলা শিশি। মনে হয় এটা ক্যাপ্টেনের ঘর। জাহাজডুবি হবার আগে হয়তো চায়ের সংগে জেলি সহযোগে রুটি খাচ্ছিলেন।

আর কোনো জিনিসপত্র কোথাও নেই। ছোট্ট দেয়াল আলমারিটা বন্ধ। ওটার মধ্যে কোনো জিনিস থাকলেও থাকতে পারে। তবে সাত রাজার ধন পাবার সম্ভাবনা আর হয়তো নেই।

খুব বেশি গরজ কারুর মধ্যে দেখা গেল না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই সুভাষ শাবল দিয়ে আলমারির দরজাটা খুলে ফেলল। আলমারির উপরের তাকে কয়েকটি খাতাপত্র আর নিচের তাকে আছে একটি বাক্স।

বাক্সটি স্টিলের। ভারী সুন্দর আর কি শক্ত! কিন্তু কোথায় চাবি? সারা তাক খুঁজে কোথাও চাবি পাওয়া গেল না।

অরুণ বলল–কি হবে বাক্সটা খুলে? রেখে দে।

স্বপন বলল–যদি ভিতরে টাকাপয়সা থাকে?

সুভাষ বলল–সত্যি, টাকাপয়সা বা মূল্যবান কোনো জিনিসপত্র হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু বাক্সটাকে ভাঙতে ইচ্ছে করছে না।

বরুণের কোমরে ঘুনসিতে চাবি ছিল একটা। সেটা দেখিয়ে বলল–দ্যাখো তো, এটা দিয়ে খোলা যায় কিনা।

সুভাষ বলল–ধ্যাৎ, ওটা তো ভেতরেই ঢুকবে না।

কিছুক্ষণ আগেও যে বাক্সটার প্রতি কারুর বিশেষ আগ্রহ ছিল না, এখন সেটার প্রতি সবারই জেগে উঠল কৌতূহল। সুভাষ বলল–এটাকে ভাঙতেই হবে।

বাক্স ভাঙা হলো শাবল দিয়ে। খুলে দেখা গেল টাকাপয়সা বা সোনাদানা ভেতরে কিছু নেই। আছে শুধু ভাঁজ করা কাগজ।

সেই কাগজটা টেনে বের করা হলো। মোটা কাগজে ইংরেজি ভাষায় কি সব লেখা–মনে হয় কোনো দলিল বা চুক্তিপত্র। সম্পূর্ণ মর্ম উদ্ধার করার মতো জ্ঞান তাদের কারুর নেই। কারণ দুর্বোধ্য ইংরেজি ভাষায় লেখা। তবে মনোযোগ দিয়ে পড়তেই এটুকু বুঝতে পারলে জাহাজটি বংগোপসাগরের একটি দ্বীপের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল।

অনেক কিছু লেখার মধ্যে হঠাৎ একটি শব্দ দেখে অরুণ ও সুভাষের চোখমুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। স্বপ্নরাজ্যের যেন এক মায়া মাখানো সেই শব্দ দু'টি–হিডেন ট্রেজার!

হিডেন ট্রেজার। গুপ্তধন। যে কথাটি তারা অনেক পড়েছে অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে তা আজ তাদের চোখের সামনেই লেখা রয়েছে।

আশ্চর্য! অবিশ্বাস্য! রোমাঞ্চকর!

অরুণ বলল–এই দলিলটা খুব যত্ন করে রাখতে হবে। কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না।

সুভাষ বলল–এই দলিলের লিখন অনুসরণ করেই আমাদের অভিযান চালাতে হবে। দেখতে হবে কোথায় আছে সেই গুপ্তধন। এই জাহাজে না এই দ্বীপের কোনো জায়গায়?

অরুণ বলল–জাহাজে কি করে থাকবে? সেই গুপ্তধন উদ্ধার করবার জন্যই হয়তো জাহাজটি এসেছিল। তার আগেই ডুবে গেল।

সুভাষ বলল–এমনও তো হতে পারে, জাহাজে ভর্তি করেছিল সেই গুপ্তধন। রওনা হবার মুখেই ডুবে গেছে।

–হ্যাঁ, তাও হতে পারে। তাহলে জাহাজটিও তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে।

–কিন্তু তার আগে কাগজটি ভাল করে পড়া দরকার। বারবার পড়লে হয়তো কিছুটা রহস্য উদ্ধার করা যাবে। এসো, একটু আলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াই। এখানে ভাল করে পড়া যাবে না।

সুভাষ অরুণের হাতে কাগজটি দিল। দু'জনে সরে গেল জাহাজের এক ধারে।

অরুণ মেলে ধরল কাগজটা। সে এবং সুভাষ দু'জনেই গলা মিলিয়ে পড়তে লাগল। একটি লাইন দু'বার তিনবার করে পড়ল। বেশ যেন একটু রহস্য ও উত্তেজনার আভাস পাওয়া যেতে লাগল ক্রমে ক্রমে।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে অরুণের হাত থেকে কাগজটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। সবাই হতভম্ব। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে কাগজটি উড়ে যাচ্ছে–আর উড়ে গিয়ে পড়ছে সমুদ্রের জলে। কিন্তু তারা অসহায়। এত বড় একটা মূল্যবান জিনিস তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, অথচ তাদের কিছু করার নেই!

[চলবে]

ছবি : নারায়ণ দেবনাথ

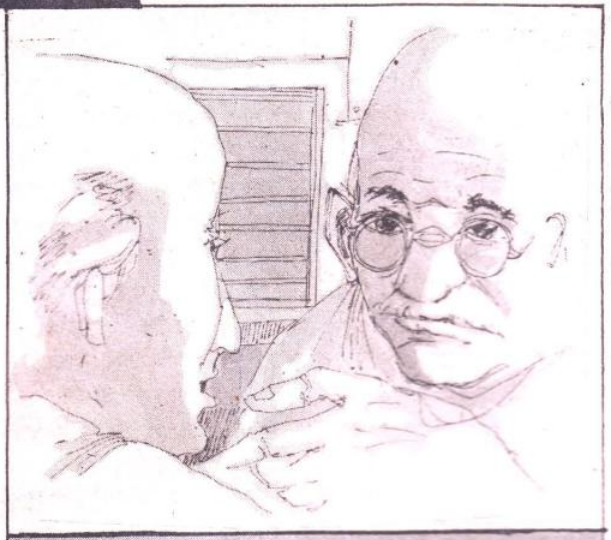

গল্প নয়, গল্পের মতো

প্রিয়রঞ্জন মৈত্র

যে কাহিনী তোমাদের শোনাতে বসেছি সেই কাহিনীর নায়ক ব্যারিস্টার এম. কে. গান্ধী তখনো মহাত্মা গান্ধী নামে পরিচিত হননি। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ তখনো অশিক্ষার অন্ধকারে।

১৯১৪ সালের কথা। আফ্রিকায় ভারতীয়দের ওপর শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে অনেক লাঞ্ছনা সয়ে কুড়ি বৎসর পর দেশে ফিরেছেন গান্ধী। বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন দেশবাসী, প্রকাশ করছেন অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

একদিন দেখা গেল একটি ট্রেনের থার্ড ক্লাসের এক কামরায় জানালার পাশে বসে এক শীর্ণকায় মানুষ খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁর কাছে একটি নয়, অনেকগুলো কাগজ। একটির পর একটি কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছেন তিনি। যাত্রীদের চিৎকার-চেঁচামেচি, বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা তাঁর পড়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারছে না।

একটি স্টেশনে গাড়ি থামতে সেই কামরায় উঠলেন এক বৃদ্ধ। তিনি জায়গা করে বসলেন শীর্ণকায় মানুষটির সামনের বেঞ্চিতে। মুখোমুখি।

আবার ট্রেন ছাড়ল।

একটু বাদেই কাশতে শুরু করলেন বৃদ্ধ। কাশতে কাশতে খানিকটা কফ ফেললেন গাড়ির মেঝেতেই।

শীর্ণকায় মানুষটি খবরের কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে দেখলেন ব্যাপারটা। তারপর খুব নম্রভাবে বললেন, 'মেঝেতে কফ না ফেলে দয়া করে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলুন।'

শীর্ণকায় মানুষটির কথা শুনে তাঁর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ব্যঙ্গ করে বৃদ্ধটি বললেন, 'আহা, কী বুদ্ধি আপনার। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়াই আর ঠান্ডা বাতাস লেগে আমার কাশিটা আরো বাড়ুক আর কি!'

শীর্ণকায় মানুষটি বললেন, 'এসময় বাতাস তেমন ঠান্ডা নয়। তাছাড়া গাড়িতে কফ ফেলা তো অনুচিত।'

বৃদ্ধ বললেন, 'ওরে আমার কে রে, আমাকে উচিত অনুচিত বোঝাচ্ছে! আমি কারো পৈতৃক জায়গায় কফ ফেলছি না। যার অসুবিধা মনে হবে সে যেন আমার সামনে থেকে উঠে যায়'– কথা বলতে বলতে আবার কাশতে লাগলেন বৃদ্ধ। এবারও কফ ফেললেন মেঝেতে।

শীর্ণকায় মানুষটি আর কিছু না বলে খবরের কাগজের কিছুটা ছিঁড়ে তাই দিয়ে সেই কফ তুলে ফেলে দিলেন জানালা দিয়ে।

আশপাশের যাত্রীরা ব্যাপারটা দেখে যেন মজা পেল। বিভিন্ন মন্তব্য করতে লাগল তারা। হাসাহাসি করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর আবার কাশতে লাগলেন বৃদ্ধ। এবার মুখ ভর্তি কফ মেঝেতে ফেলতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেলেন। কী যেন একটু ভাবলেন তিনি। একবার তাকালেন শীর্ণকায় মানুষটির দিকে। তারপর মুখখানা ব্যাজার করে জানালা দিয়ে বাইরে ফেললেন কফ।

শীর্ণকায় মানুষটির ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটল। খবরের কাগজে চোখ রাখলেন তিনি।

ট্রেনটা ছুটতে ছুটতে আবার এসে থামল একটা স্টেশনে।

সেই স্টেশন তখন লোকে লোকারণ্য। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল এই ট্রেনটির জন্যই।

ট্রেন থামতেই কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন শীর্ণকায় মানুষটি। তাঁকে দেখতে পেয়েই হৈ-হৈ করে ছুটে এলো লোকেরা। পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। কত যে মালা পরানো হলো তাঁকে তার ঠিক নেই।

ট্রেনের বৃদ্ধটি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন ওই শীর্ণকায় মানুষটিই আফ্রিকা ফেরত ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যাঁর নাম লোকমুখে আগেই শুনেছিলেন তিনি।

হতবাক বৃদ্ধটি কী যেন চিন্তা করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন কামরাটির দরজার দিকে। সেই সময়ই একজনের হাত থেকে মালা নিতে ঘুরে দাঁড়ালেন গান্ধী। চোখাচোখি হয়ে গেল বৃদ্ধটির সঙ্গে। গান্ধী দেখলেন, দরজার মুখে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ; যেন তাঁর ব্যবহারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

অজানা পৃথিবী

অপরাজিতা

বরফ গুহার কথা

অস্ট্রিয়ার আল্পস্ পর্বতের বুকে পৃথিবীর সব থেকে বড় যে বরফ গুহাটা আছে তার নাম, আইশ্রি-য়েসেনওয়েল্ট (EISRIESENWELT)। আর পাঁচটা সাধারণ গুহার মতো এই গুহা নয়। এর ভিতরে শুধুই বরফের রাজত্ব।

আল্পসের এই অংশটা চুনা পাথরের তৈরি। যুগ-যুগান্তর ধরে পাহাড়ী ফাটলের মধ্যে দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে বিরাট গুহার সৃষ্টি হয়েছে। জলের মধ্যে সামান্য অ্যাসিড থাকে, তাতেই চুনা পাথরকে গলিয়ে দিয়ে গুহার গোলকধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে। ভিতরে একের পর এক অনেকগুলো গুহাগহ্বর আছে। তার প্রত্যেকটাতেই বরফের রাজত্ব।

আবহাওয়া এখানে প্রচন্ড ঠান্ডা। গুহার মধ্যে জল চুঁইয়ে পড়েও খুব বেশি। বৃষ্টির জলও ফাটল দিয়ে গুহার মধ্যে ঝরে পড়ে। গুহার মধ্যে সারা বছর ধরে জমে থাকা বরফের জন্য তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকে। তাই চুঁইয়ে আসা আর ঝরে পড়া জলধারা সঙ্গে সঙ্গে জমে যায়।

এই জমে যাওয়া জলধারাই নানান আকারের স্ট্যালাকটাইট স্ট্যালাগমাইটের আকৃতি নেয়। কোথাও এগুলোকে বরফ-জমা দেওয়াল বলে মনে হয়। কোথাও যেন জলপ্রপাত জমে গিয়েছে। কোথাও গম্বুজের মতো, কোথাও যেন থাম। এক জায়গায় তো ওগুলো সারি-বাঁধা থামের মতো দাঁড়িয়ে। কয়েকটা আবার সরুমুখ সূঁচের মতো। এক জায়গায় হাল্কা পর্দার মতো ঝুলে আছে। এর অনেকগুলোই আবার বেশ স্বচ্ছ।

গ্রীষ্মকালেও এখানে বরফ গলাবার মতো গরম পড়ে না। ফলে গুহার মধ্যে অদ্ভুত সুন্দর আকৃতির ওইসব স্ট্যালাকটাইট স্ট্যালাগমাইট সারা বছর দেখা যায়।

ভিতরের গুহাগহ্বরগুলো একটা অন্যটার সঙ্গে সরু পথ দিয়ে যুক্ত। একটা গুহাগহ্বর থেকে তাই অন্যটাতে যাওয়া যায়।

আইশ্রিয়েসেনওয়েল্ট-এর খবর আঠারশ' ঊনআশি সালের আগে কেউই জানত না।

উপত্যকা থেকে গুহামুখের উচ্চতা হাজার মিটারের মতো। রোপওয়ের সাহায্যে গুহামুখে পৌঁছাতে হয়। ভিতরে যাত্রীদের জন্য বিজলি আলোর ব্যবস্থা আছে। বরফের বুকে সে আলো পড়লে নানান রঙের খেলা অপূর্ব দেখায়। তখন যেন গুহাটা স্বপ্নরাজ্য হয়ে ওঠে।

যেমন কর্ম তেমনি ফল

অসীম চৌধুরী

স্ট্যাম্প এবাউট ভীষণ বদমেজাজী লোক। তিন তিনটে চিঠি লেখার পরও টাইল যখন স্ট্যাম্পের বাড়ির ছাদের ভাঙা টাইল মেরামত করতে এলো না তখন স্ট্যাম্প রেগেমেগে তার বোনকে বলল, দেখলে তো তিন তিনটে চিঠি দিলাম, তাও টাইলের আসবার নাম নেই। বলে বেড়াচ্ছে সে নাকি ব্যস্ত। আমার ছাদ মেরামত করার সময় নেই। দেখতে পেলে ওকে দেখে নেবো। কথাটা বলে স্ট্যাম্প মেঝেতে সজোরে পা ঠুকল।

স্ট্যাম্পের বোন বলল, কার্পেটের উপর পা ঠুকে ধুলো উড়িও না। আমার মনে হয় তোমার মেজাজের জন্য কেউ তোমার কাছে কাজ করতে চায় না। এখন দয়া করে রাগের মাথায় অমন করে পা ঠুকে আর ধুলো উড়িও না। যদি ধুলো ঝাড়তেই চাও তো কার্পেটটা বাইরের দড়িতে টাঙিয়ে লাঠিপেটা করো, তাহলেই কাজ হবে।

স্ট্যাম্প রাগে ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলল, বাজে বোকো না তো। যাচ্ছি টাইলকে মজা দেখাতে।

স্ট্যাম্প মাথায় টুপি চাপিয়ে টাইলের বাড়ির দিকে এগোতেই দেখতে পেল টাইলকে। ওর হাতে কাজ করার যন্ত্রপাতি। স্ট্যাম্প এক দৌড়ে টাইলের কাছে গিয়ে বলল, বাঃ, মনে হচ্ছে তুমি আমার কাজের জন্যই যাচ্ছো?

টাইল জবাব দিল না।

স্ট্যাম্প বলল, একটিও কথা না বলে, ভালো চাও তো আমার সঙ্গে চলো।

বেঁটেখাটো টাইল লম্বা রাগী স্ট্যাম্পের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ, চলুন।

কিছুটা যাবার পর টাইল বলল, আপনি জোর-জবরদস্তি করছেন, তাই না গিয়ে উপায় নেই। তবে আপনার কাজ ভালো করে করতে পারবো না।

স্ট্যাম্প বলল, দেখি তুমি কেমন ভালো করে কাজ না করো? আমি তোমার সামনে বসে কাজ করাবো। ঠিকমতো কাজ না করলে একটা পেনিও পাবে না। যাও কিছু টালি আর মালমশলা নিয়ে এসো। এক কৌটো রং-ও আনবে, বৃষ্টির জল যাবার পাইপটাতে রং দিতে হবে। শোনো কথা, বলে কিনা কাজ করবো না! আমি ছাদের চিমনির ছায়ায় বসে বসে তোমার কাজ দেখবো। আবদার!

টাইল বলল, সামনে বসে কাজ দেখবেন? বেশ, ভালো কথা। যাই তাহলে মালপত্তর নিয়ে আসি।

স্ট্যাম্প খপ করে টাইলের একটা হাত ধরে বলল, পালাবে না। যা বললাম তাই করো।

টাইল পালিয়ে গেল না। দরকারি মালপত্তর নিয়ে স্ট্যাম্পের সঙ্গে সঙ্গে নানান কথাবার্তা বলতে বলতে চলল।

বাড়ির কাছে এসে স্ট্যাম্প বলল, গুদাম ঘরের মধ্যে একটা মই আছে, নিয়ে এসো। সিঁড়ি দিয়ে সোজা ছাদে উঠে কাজ শুরু করে দাও। আজ খুব ঠান্ডা পড়েছে—যাই এক কাপ কোকো খেয়ে আসি। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে দেখছি তুমি কাজে কেমন করে ফাঁকি দাও।

টাইল স্ট্যাম্পের নির্দেশমতো মইটা এনে ছাদে উঠল। স্ট্যাম্প তখন বাড়ির মধ্যে গরম কোকো খেতে ব্যস্ত। গরম কোকোর কথা মনে হতেই টাইল মনে মনে খুব চটে গেল।

টাইল ছাদে উঠে দেখল দুটো চিমনি। একটা থেকে ধোঁয়া উঠছে। টাইল মেরামত করার জন্য টালি সিমেন্ট ছাদে রেখে নিচে এসে মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে রং-এর কৌটো আর বুরুশটা নিয়ে ছাদে এলো। স্ট্যাম্প তখন মহা আনন্দে ঘরের মধ্যে গরম গরম কোকো খাচ্ছে। টাইল রং-এর কৌটোটা যে চিমনিটা থেকে ধোঁয়া উঠছে না তার পাশে রেখে বুরুশটা রং-এ

চুবিয়ে চিমনি-পটটা খুব ভালো করে দু-তিনবার রং করল।

স্ট্যাম্প তো জানেই না, কৌটোর গায়ে হোয়াইট পেন্ট ছাপ দেওয়া থাকলেও, টাইল কৌটো খুলে তার মধ্যে রং-এর বদলে কড়া সিরিস আঠা নিয়ে এসেছে। রং লাগাতে লাগাতে টাইল তো নিজের মনে হেসেই খুন। রং লাগাবার পর যেন কিছু জানে না এমন গোবেচারীর মুখ করে ছাদের ভাঙা টালি মেরামত করতে লাগল। কাজ করতে করতেই দেখল স্ট্যাম্প ছাদে উঠেছে। ছাদে উঠেই টুলের উপর বসার মতো করে সদ্য রং লাগানো চিমনির বাঁধানো জায়গার উপর বসল। তারপর টাইলের দিকে তাকিয়ে বলল, নাও এখন তুমি টাইল মেরামতের কাজটা চটপট করে ফেল। আমি দেখছি, তুমি কাজটা ভালোভাবে করো কিনা। কাজ ঠিক না হলে মজুরি পাবে না।

টাইল কাজ করতে করতে উত্তর দিলো, এ কাজের জন্য আপনাকে বা আপনার বোনকে পাঁচ পাউন্ড দিতে হবে। এই পাঁচ পাউন্ড ছাড়া, আরও আপনাকে আপনার মেজাজের জন্য পাঁচ পাউন্ড দিতে হবে।

টাইলের কথা শুনে স্ট্যাম্প নির্ঘাত ছাদ থেকে পড়ে যেত যদি না টাইলের সিরিস আঠার দৌলতে চিমনির বাঁধানো জায়গার সঙ্গে সেঁটে না থাকত। জায়গা ছেড়ে উঠতে না পেরে স্ট্যাম্প অসম্ভব রেগে গিয়ে ছাদের টালিতে পা ঠুকতে লাগল। পা ঠোকার ঠেলায় আরও দু-একটা টালি আলগা হয়ে গেল।

টাইল বলল, মিস্টার স্ট্যাম্প, রাগের মাথায় যদি আপনি জোরে জোরে পা ঠোকেন তাহলে মেরামতের জন্য আরও মজুরি দিতে হবে। আমি অবশ্য বেশি মজুরি নিতে একটুও লজ্জিত হই না।

টাইলের কথা শুনে স্ট্যাম্প আরও বেশি করে পা ঠুকতে লাগল। ঘন ঘন হুঙ্কার দিতে লাগল। টাইল সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে আপন মনে কাজ করতে লাগল। কাজ শেষ হলে মই বেয়ে নিচে নেমে এলো। তারপর স্ট্যাম্পকে হাসতে হাসতে বলল, আপনার কাজের জন্য পাঁচ পাউন্ড পাঁচ শিলিং দিতে

উনি বোধহয় নিচে নামতে পারবেন না।

হবে। আপনার বোনের কাছ থেকে পেমেন্ট নিয়ে যাচ্ছি। আমি জানি আপনি পাঁচ পাউন্ড পাঁচ শিলিং আমাকে দেবেন না।

স্ট্যাম্প পুনরায় চিমনির উপর থেকে ওঠবার চেষ্টা করল। কিন্তু এমনভাবে সিরিস আঠায় আটকে গেছে যে এক ইঞ্চিও নড়তে পারল না। স্ট্যাম্প রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ছাদ থেকে বলল, সাবধান টাইল, তুমি আমার বোনের কাছ থেকে একটা পেনিও নিও না। আমি তোমাকে এক পাউন্ডের বেশি কিছুতেই দেবো না। তোমার কাজের তুলনায় এক পাউন্ডও অনেক বেশি মনে রেখো।

টাইল বলল, খুব সাবধান। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আরও দুএকটা টালি ভাঙবে।

টাইল স্ট্যাম্পের বাড়ির মধ্যে ঢুকে স্ট্যাম্পের বোনের কাছে পাঁচ পাউন্ড পাঁচ শিলিং চাইল। স্ট্যাম্পের বোন বাইরে এসে বলল, দাঁড়াও দাদার কাছে জেনে নিই। তুমি যা চাইছো তা হয়তো ঠিক নয়।

টাইল মুচকি হেসে বলল, উনি বোধহয় নিচে নামতে পারবেন না। চিমনির সঙ্গে গেঁথে গেছেন। তারপর পাঁচ পাউন্ড পাঁচ শিলিং নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

স্ট্যাম্পের তখন খুবই অসহায় অবস্থা। একচুল নড়তে পারছে না। চিৎকার করতে লাগল, বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও।

কিন্তু চেঁচালে কী হবে? কে তাকে ছাদে উঠে এসে বাঁচাবে? পাড়াপড়শীরা তার বদমেজাজের জন্য তাকে দেখতে পারে না। তারা সকলে মনে মনে খুশিই হলো।

অগত্যা স্ট্যাম্পকে বৃষ্টি না পড়া পর্যন্ত সেই অবস্থায় ছাদে বসে থাকতে হলো। বৃষ্টি পড়বার পর সিরিসের আঠা নরম হলে স্ট্যাম্প রাগে হাত, পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে কুপোকাৎ!

সেই দেখে স্ট্যাম্পের বোন রাগ করে বলল, তোমার কী হয়েছে বলো তো? পিছলে পড়ে গেলে? সত্যি তোমার অবস্থা দেখে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

বেচারী স্ট্যাম্পের তখন বলার কী আছে বলো? বোনের কথার জবাব না দিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। স্ট্যাম্প বহুদিন ছাদের উপর চিমনির সঙ্গে সেঁটে যাওয়ার মর্মান্তিক দুঃখ ভুলতে পারেনি। পড়শীরা খুব খুশি। আর তোমরা?

ইনেড ব্লাইটনের 'মিঃ স্ট্যাম্প এবাউট ইন এ ফিক্স' অবলম্বনে

ছবিঃ সুফি

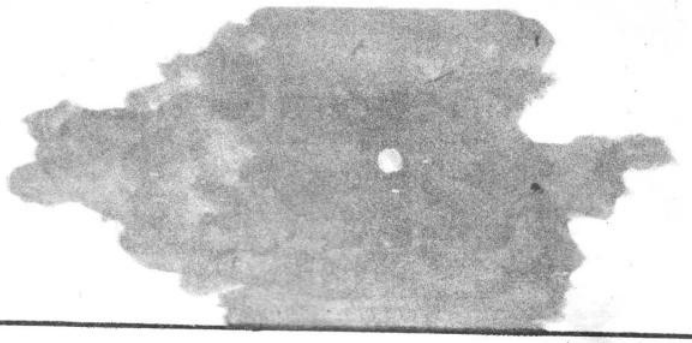

জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন ঃ

১। যুদ্ধে সাহস দেখানোর জন্য আমাদের দেশে যে সর্বোচ্চ পুরস্কারটি দেওয়া হয় তার নাম কি?
২। রঙিন টিভির মূল তিনটি রং কি কি?
৩। কোন দিনটি বিশ্ব-মানব-অধিকার দিবস হিসাবে পালন করা হয়?
৪। আমাদের দেশের সবচাইতে ছোট জেলা কোনটি?
৫। কোন ভারতীয় নেতার ছবি প্রথম ডাকটিকিটে ছাপা হয়?
৬। অপারেশনের সময় অসাড় করতে যে ওষুধ ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যানাসথেসিয়া নাম দেন একজন কবি ও প্রবন্ধ লেখক। তিনি কে?
৭। বিপদে পড়লে কোন পশু মরার ভান করে পড়ে থাকে?
৮। প্লুটোর উপগ্রহ কে আবিষ্কার করেন?
৯। দেশে রাসায়নিক শিল্পের গোড়াপত্তন কে করেন—এস. এস. ভাটনগর, পি. সি, রায়, টি. আর. শেষাদ্রি না সি. এন. আর. রাও?
১০। এশিয়ার সবচেয়ে বড় অপটিক্যাল টেলিস্কোপ কোথায় আছে?

উত্তর ঃ

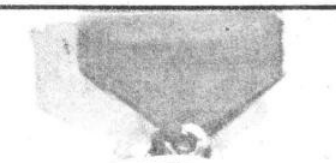

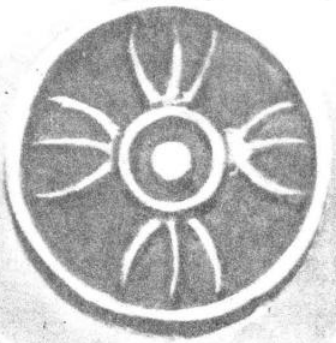

১। পরমবীরচক্র।
২। লাল, নীল ও সবুজ।
৩। ১০ ডিসেম্বর।
৪। পন্ডিচেরির মাহে জেলা। এর আয়তন মাত্র ৯ বর্গ কিলোমিটার।
৫। মহাত্মা গান্ধীর। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১৯৪৮ সালের ১৫ আগস্ট এই ডাকটিকিটটি প্রকাশ করা হয়।
৬। অলিভার ওয়েনডেল হোমস্।
৭। হায়না।
৮। জেমস ডবলু ক্রিসটি।
৯। পি. সি. রায়।
১০। তামিলনাড়ুর কাভালুর-এ। কাভালুর-এর ২.৩৪ মি. ভাইনু বাপ্পু টেলিস্কোপ এশিয়ার সবচেয়ে বড় অপটিকাল টেলিস্কোপ।

ছবি ঃ রাহুল মজুমদার

বুটজোড়া দেখতে না পেয়ে বিলি ভীষণ ঘাবড়ে গেলো

বিলির বুট

(৩৪)

বিলি প্রাক্তন ফুটবলার ডেড সটের একজোড়া বুট খুঁজে পেয়েছিলো। ঐ বুটটা পরে খেললেই বিলির খেলা একদম ডেড সটের মতো হয়ে যায়। বিলি ওদের স্কুলদলের অতিরিক্ত তালিকায় ছিলো। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় চারজন খেলোয়াড় আহত হওয়ায় বিলি ও তিনজন নতুন খেলোয়াড় স্কুল কাপের ফাইনালে কেনউড স্কুল দলে চান্স পেলো। শহর ভেঙে মানুষ এসেছেন খেলা দেখতে। প্রচন্ড উৎসাহ আর উত্তেজনার মধ্যে গোল করে বিলি কেনউড স্কুলকে এগিয়ে দিলো।

বিলি কি গোল করতে পেরেছিলো? জানতে পারবে শুকতারার অগ্রহায়ণ সংখ্যায়।

ত্রয়ীর অভিযান

পরাশর রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী' অফিসঘরে ঢুকল তিনজনে। মোটু দ্রুত কাচভাঙা একটা আলমারী থেকে জুতোর সোলের ছবিটা বের করল। টেবিলে পাতল। শশীবাবুর জুতোর সোলের সঙ্গে মেলাতে লাগল তিনজনে। কিন্তু হতাশ হলো। শশীবাবুর জুতোর সোলের খাঁজগুলো কাটা কাটা। ছবিরটা ঢেউ খেলানো। শান্ত সাবধানে ইজিচেয়ারে বসে পড়ল। মোটু আর শেলী চেয়ারে বসল। তিনজনেই গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

মোটু নীরবতা ভঙ্গ করল। বলল–'সাহেব বুড়ো মিলনকে কারো সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলতে দেখেছিল। মনে হয় সেই লোকটিই শশীবাবু। মিলন আর শশীবাবু দু'জনে মিলে আগুন লাগিয়েছে।'

শান্ত বলল–'হতে পারে। ওরা দু'জনেই পরস্পরের পরিচিত। দু'জনে মিলে গগনবাবুর ওপর শোধ তুলেছে।'

শেলী উঠে দাঁড়াল। বলল–'বাড়ি যাবো। তাড়াতাড়ি ঠিক কর কী করবি এখন?'

মোটু বলল–'শান্ত, শোন–চল আবার আমরা গীতুর কাছে যাই।'

'আহা–গীতু তো সেদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়িতে ছিলই না।' শান্ত বলল।

'কে বলতে পারে গীতু পরে গগনবাবুর বাড়ি গিয়েছিল কিনা আর বাগানে লুকিয়ে ছিল কিনা?' মোটু বলল।

শান্ত হেসে বলল–'দেখছি–মজিলপুরের অন্দেক লোক সেদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়ির কাছে গিয়েছিল।'

–'তাই তো দেখছি'–মোটু বলল– 'সাহেব বুড়ো, গীতুর মা, মাসী, মিলন নস্কর, শশী সামন্ত, আরো কে কে জানে! যাক্‌গে চল, গীতুর সঙ্গে কথা বলবো কালকেই। ও মিলনকে সাবধান করে চিঠি দিয়েছে। তার মানে ও অনেক কিছু জানে।'

'ঠিক আছে।' কথাটা বলে শান্ত উঠে দাঁড়াল–'চল কালকে বিকেলে।'

শেলী ও মোটু উঠল।

পরদিন বিকেলে অফিসঘর থেকে বেরুল তিনজনে। মোটু একটা পলিথিনের থলেয় করে তেলাপিয়া মাছ নিয়েছিল ধবলী আর বাচ্চাগুলোর জন্যে।

তিনজনে গগনবাবুর বাড়ির সদর দেউড়ী পেরিয়ে রান্নাঘরের কাছে এল। মোটু উঁকি দিয়ে দেখল গীতুর মার বিছানা খালি। শান্ত ডাকল–'গীতুর মা–গীতুর মা।'

রান্নাঘর থেকে গীতু বেরিয়ে এল। ওদের দেখে হাসল বলল–'মা নেই, মাসীর বাড়ি গেছে। বসো তোমরা।' গীতুকে বেশ খুশি খুশি মনে হলো। মার বকাঝকা নেই।

মোটু পলিথিনের ব্যাগটা এগিয়ে ধরে বলল–'ধবলীদের জন্যে মাছ এনেছি নাও।'

ব্যাগটা নিয়ে গীতু বলল–'আজকে তো নিরামিষ রান্না হয়েছে দুপুরে। ধবলী আর বাচ্চাগুলো মাছ পেলে খুব খুশি হবে গো।' ও মাছগুলো ধবলী আর বাচ্চাগুলোকে দিয়ে এল।

শান্ত বলল–'মিলনবাবুকে তোমার চিঠি দিয়ে এসেছি।'

'আমিও আজগে মিলনদার চিঠি পেয়েছি। আর বলোনি, সি যে থানার বটেশ্বর–সি গেছলো মিলনদার বাড়ি। কী সব বলে মিলনদাকে ভয় পাই দেছে। মিলনদা ভেবেই পাচ্ছে না এখন কী করবে।' গীতু বলল।

'বটেশ্বর কি মিলনবাবুকে সন্দেহ করেছে?' মোটু বলল।

'হ্যাঁ–অনেকেই বলচে এ মিলনদার কাম। কিন্তু আমি জানি তা নয়।' গীতু বলল।

'তুমি কী করে জানলে? তুমি তো সেদিন সন্ধ্যেবেলা এখানে ছিলেই না।' শান্ত বলল।

'জানি গো জানি।' তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে গীতু চাপা গলায় বলল–'তুমরা পেতিজ্ঞে (প্রতিজ্ঞা) করো কাউকে কিছু বলবে নে।'

'না, বলবো না।' মোটু বলল।

'তা'লে শুন–' গীতু বলল–'আমি সিদিন সন্ধ্যেবেলা মিলনদার বাড়ি গেছলাম। উখানে ছিলাম রাত নয়টা অব্দি। তারপর রিস্কায় চড়ে ফিরে এলাম। তখন রাত দশটা হবে।'

শান্ত, মোটু আর শেলী পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করল। শেলী বলল–'তা একথা তুমি কাউকে বলোনি কেন? বললে কেউ মিলনবাবুকে সন্দেহ করতো না।'

গীতুর মুখটা ভারী হলো। বলল– 'মা মিলনদাকে দু'চক্ষে দেক্‌তি (দেখতে) পারে না। আমি উয়ার (ওর) বাড়ি গেছি শুনলি মা আমাকে ঝ্যাঁটাপেটা করবে।'

'তোমরা কি সারাক্ষণ ওখানেই ছিলে?' শেলী বলল।

'না–' গীতু বলল–'এক ঘন্টার জন্যি মিলনদার বড় বোনের বাড়ি গিয়েছিলাম। উখানে চা-টা খেয়েছিলাম।'

'ওখানে গিয়েছিলে কেন?' মোটু জানতে চাইল।

'মিলনদার তো চাকরি চলি গেল। উর জামাইবাবু বলেছেল উয়াকে (ওকে) চাকরি দেবে। তাই গিয়েছিলাম।' গীতু বলল।

শান্ত এবার বলল–'একজন লোক মিলনকে সেদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়ির বাগানের ধারে দেখেছে।'

'না–না–অসম্ভব।' গীতু চমকে বলে উঠল।

'গীতু, সত্যি কথা বলো।' শান্ত একটু গম্ভীর ভংগীতে বলল।

'কী করি দেখবে?' গীতু বলল–'কত্তাবাবু আর ডেরাইভার (ড্রাইভার) হীরুদা ছেল বাইরে। মা আর মাসী গল্প করছিল রান্নাঘরে। কেউ তো ছেলনি।'

মোটু বলল–'তুমি এসব জানলে কী করে? তোমরা নিশ্চয়ই এখানে এসেছিলে?'

গীতু ঢোক গিলল। বলল–'সব বলতেছি। কিন্তু তুমরা পেতিজ্ঞে (প্রতিজ্ঞা) করেচ কারুকে কিছু বলবে না–মনে থাকে য্যান।' একটু থেমে বলল–'হ্যাঁ–মিলনদা কিছু জিনিসপত্র এই বাড়িতে ফেলে গেছল। উ সেগুলি নিয়ে আসবে বলল। আমি বললাম কত্তাবাবু কলকেতা গেছে, বাড়ি খালি। এই ফাঁকে নে এসো। আমরা মিলনদার দিদির বাড়ি থেকে চা-টা

জুতোর সোলের সংগে মেলাতে লাগল তিনজনে।

খেয়ে রিস্‌কায় চড়ে এখানে এলাম। বাগানের বেড়ার ধারে নুকিয়ে (লুকিয়ে) রইলাম। লক্ষ্য রাখলাম কেউ দেখছে কিনা।'

শান্তরা বুঝল সাহেব বুড়ো ঠিকই বলেছিল। সাহেব বুড়ো মিলনকে কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল। তাহলে সে হচ্ছে গীতু।

গীতু বলতে লাগল–'মা তখন মাসীর সঙ্গে রান্নাঘরে গল্প করতেছে। মিলনদা সেই ফাঁকে একটা খোলা জানালা দিয়ে বাড়ির মধ্যি ঢুকল। নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেড়ার ধারে ফিরে এল। তারপর আমরা কিছুদূর হেঁটে গিয়ে রিস্‌কায় চড়ি চলে গেলাম। কেউ দ্যাখেনি আমাদের।'

শান্ত বলল–'তাহলে তোমার মিলনদা লাইব্রেরী ঘরের দিকে যায়নি?'

'না'–গীতু বলল–'একটু ক্ষণের মধ্যেই মিলনদা চলে এয়েছেন। তাছাড়া মিলনদা এরকম কাম কত্তি পারে না।'

শান্ত একটু ভেবে বলল–'তাহলে দেখা যাচ্ছে মিলন নস্কর এ কাজ করেনি। কিন্তু তাহলে আগুন লাগাল কে?'

শেলী বলল–'বাকি রইল শশিশেখর সামন্ত।'

গীতু চমকে উঠল শেলীর কথাটা শুনে।

'কী হলো তোমার?' শান্ত জিজ্ঞেস করল।

গীতুর যেন হাঁপ ধরেছে। সেইভাবে ও বলল–'উ কি করি জানল যে শশীবাবু এখানে এয়েছেন?'

এবার শান্তদের অবাক হবার পালা। শান্ত বলল–'আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু গীতু–তুমি চমকে উঠলে কেন? তুমি কি শশীবাবুকে সেদিন সন্ধ্যেবেলা এখানে দেখেছিলে?'

'আমি না। মিলনদা যখন ওপরের ঘর থেকে তার জিনিসপত্র আনছেল–তখন শশীবাবুকে দেখেছেলে–বাগানের দিককার দরজা দিয়ে ঢুকতেছে।'

'সত্যি?' শান্ত বলল। তিনজন মুখ চাওয়াচায়ি করল।

মোটু বলল–'তাহলে শশীবাবুও এখানে এসেছিলেন?'

'হুঁ, তাই সেদিন সন্ধ্যেবেলা কোথায় গিয়েছিলেন এটা জানতে চাইলে শশীবাবু কেমন চমকে উঠেছিলেন।' শান্ত বলল।

'তাহলে এটা শশীবাবুর কান্ড। হ্যাঁ, শশীবাবুই আগুন লাগিয়েছে।' শেলী বলে উঠল।

মোটু গীতুকে জিজ্ঞেস করল–'তুমি কী বলো?'

'জানি না।' গীতু বলল–'শশীবাবু খুব ভদ্দরনোক। মানুষও খুব ভালো। উ ই কাম কত্তি পারে না।'

শান্ত বলল–'মিলন নস্কর নয়, এবার নজর দিতে হবে শশীবাবুর দিকে।'

মোটু বলল–'আজকে আমরা অনেক গোপন খবর জানলাম।'

'আমার কথা কাউকে বলোনি য্যান।' গীতু বলল।

'না–না,' শান্ত বলল–'আচ্ছা গীতু, আমরা যাচ্ছি।'

ত্রয়ী সত্যসন্ধানী অফিসে এল তিনজনে। বসল।

শেলী বলল–'শশীবাবুর জুতোর সাইজ মিলে যাচ্ছে। শুধু জুতোর সোলের নকশাটা মেলেনি। এও হতে পারে যে শশীবাবু ঐ জুতোজোড়া কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।'

'অসম্ভব না।' শান্ত বলল–'তবে শুধু এদের মধ্যে কাউকে যদি পেতাম যে একটু ছেঁড়া হলুদ জাম্পার পরে–তাহলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যেত।'

'যাক–এখন কী করবো আমরা তাই বল্।' মোটু বলল।

শেলী বলল–'আচ্ছা তোরা যখন শশীবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলি তখন শশীবাবু কী জুতো পরেছিলেন?'

শান্ত আর মোটু পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কিছুতেই মনে পড়ছে না শশীবাবু কি জুতো পরেছিলেন। হঠাৎ মোটুর মনে পড়ল শশীবাবু পড়ার ঘরে ঢোকার সময় পাপোশে পা ঘষেছিলেন। 'হ্যাঁ'–মোটু লাফিয়ে উঠল–'বুটজুতো।'

'ঐ বুটজোড়াই সেদিন উনি পরেছিলেন।' শেলী বলল।

শান্ত একটু ভেবে বলল–'অসম্ভব নয়।'

মোটু বলল–'এইজন্যেই আলনার নিচে ঐ বুটজোড়া খুঁজে পাইনি। তখন ঐ বুটজোড়াই শশীবাবু পরেছিলেন।'

শান্ত ইজিচেয়ার ছেড়ে সাবধানে উঠল। বলল–'আর দেরি নয়। আজ রাতেই শশীবাবুর বাড়িতে হানা দিতে হবে।'

'আমিও যাবো।' শেলী বলল।

'না, তুই না। তোকে বাড়িতে না পেলে খোঁজ পড়বেই। সব জানাজানি হয়ে যাবে। মোটু আর আমি যাবো।' শান্ত বলল।

মোটু লাফিয়ে উঠল–'কখন যাবি?'

'রাত ঠিক সাড়ে ন'টায়। তুই শশীবাবুর বাড়ির দেয়ালের পাশে থাকবি। আমি থাকবো গেট-এর পাশে কামিনী গাছটার নিচে। তুই কুকুরের ডাক দিতে জানিস?'

মোটু দু'হাতের চেটো মুখে গোল করে ধরে ভৌ ভৌ করে ডেকে উঠল। শান্ত বলল–'ঠিক আছে।'

মোটু বলল–'আমি বেড়ালের ডাক কোকিলের ডাক ডাকতে জানি।'

'দরকার নেই,' শান্ত বলল–'তাহলে আজকে রাত ঠিক সাড়ে ন'টায়।'

মোটু আর শেলী উঠে দাঁড়াল।

মোটু রাতের খাওয়া সাড়ে আটটার মধ্যে সেরে নিল। রাত দশটার আগে ও বড় একটা খায় না। সেদিন তাড়াতাড়িই খেয়ে নিল। মা অবশ্য খাবার এগিয়ে দিতে দিতে বললেন–'এত তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছিস যে?'

মোটু বলল–'পড়া তৈরি করতে হবে। একটু রাত হবে শুতে। আমি বাইরের ঘরে শোব মা।'

'বেশ।' মা আর কিছু বললেন না। মোটু মাঝে মাঝে পড়াশুনোর চাপ থাকলে বাইরের ঘরে থাকে। বেশ রাত পর্যন্ত পড়ে।

মোটু বাইরের ঘরে এসে বিছানায় বসল। প্যান্ট, জামা, বোতাম লাগানো উলের জ্যাকেটটা নিয়ে এসেছিল। এবার টেবিল ল্যাম্পটা জেলে পরের দিনের দুটো বাংলা প্রশ্নের

উত্তর লিখল। ইংরেজীর উত্তরটা শুরু করেই টেবিল-ঘড়ির দিকে তাকাল। ন'টা দশ। ও দ্রুত হাতে বইপত্র গুছিয়ে রেখে জামাপ্যান্ট জ্যাকেট পরে নিল। আজকাল লোডশেডিং তো লেগেই আছে। মোটু শখ করে একটা পেন্সিল টর্চ কিনেছিল। সেটাও পকেটে নিল। খেয়ে আসার সময় রান্নাঘর থেকে একমুঠো নিমকি বিস্কুট পাঞ্জাবির পকেটে পুরে এনেছিল। এবার সেগুলো প্যান্টের পকেটে পুরে নিল। শশীবাবুর বুটটা তক্তপোশের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। সেটা উলের জ্যাকেটের ভেতরে পুরে নিল। পেটের কাছটা উঁচু হয়ে রইল। উপায় নেই। শশীবাবুর বুটটা ফেরৎ দিতে হবে তো।

বাইরের রাস্তায় যখন এসে দাঁড়াল, দেখল আকাশে চাঁদটা অনুজ্জ্বল। মেটে জ্যোৎস্না পড়েছে রাস্তায় দু'পাশের বাড়িঘরে। চারদিকে কুয়াশার জটলা। তবে ঠাণ্ডাটা একটু কম।

শশীবাবুর বাড়ির দেয়ালের কাছে এল মোটু। একপাশে একটা বটগাছ। ও বটগাছের নিচে দাঁড়াল। ও তখনও বুঝতে পারেনি বটগাছটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে 'অট্যাওবাবু' বটেশ্বর। মোটু একবার শশীবাবুর বাড়ির দিকে ভালো করে তাকাল। নাঃ, কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। তার মানে শশীবাবু আর তাঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছেন। যাক্–এতে সুবিধেই হলো। কিন্তু শান্ত এসে পৌঁছেছে কি? মোটু দু'হাতের চেটো গোল করে কুকুরের ডাক ডাকতে গেল। কিন্তু ডাকা আর হলো না। চোখের ওপর টর্চের তীব্র আলো। মোটু ভীষণভাবে চমকে উঠে চোখ বন্ধ করল। তারপর খুলল। আধো অন্ধকারে দেখল বটেশ্বরের গম্ভীর মুখ। পালাবে বলে ডান পা বাড়াতেই বটেশ্বর শক্ত হাতে ওর ডান হাতটা ধরে ফেলল। দিল এক ঝাঁকুনি। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকেটের একটা ঢিলে বোতাম খুলে গেল। বুট জুতোর ডগাটা বেরিয়ে পড়ল। বটেশ্বর টর্চ জ্বালল। বুটের ডগা দেখেই ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। বলল–'ঐ জুতোটা খোল।' মোটু জ্যাকেটের বোতাম খুলে বুটটা বের করল। বটেশ্বর জুতোটা হাতে নিয়েই ওলটাল। সোলটা দেখল। বলল–'এই জুতো কোথায় পেলে?'

মোটু চুপ করে রইল।

'আর এক পাটি কোথায়?'

'জানি না।' মোটু বলল।

'কোত্থেকে পেলে?'

'একজন দিয়েছে।'

'হুঁ–চলো আমার সঙ্গে। তোমাকে আরো কিছু জিজ্ঞেস করার আছে।' বটেশ্বর বলল।

বটেশ্বর মোটুর হাত ধরে টানল। মোটু এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। বটেশ্বরের হাত থেকে টর্চ মাটিতে পড়ে গেল। মোটু আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা আর আবছা অন্ধকারের মধ্যে এক লাফ দিয়ে সরে এল। তারপর

মোটু চমকে উঠে চোখ বন্ধ করল।

পাঁই পাঁই ছুটল রাস্তা দিয়ে। পেছনে বটেশ্বরের চিৎকার শুনল–'পাক্‌ড়ো–পাক্‌ড়ো।' কিন্তু মোটু ততক্ষণে বেশ দূরে চলে এসেছে।

বাজারের মোড়ে এসে মোটু থামল। শীতের রাত। এর মধ্যেই রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে গেছে। চায়ের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চিতে বসল। হাঁপাতে লাগল। হাঁপ একটু কমলে পকেট থেকে নিমকি বিস্কুট বের করল। বিস্কুট চিবুচ্ছে, তখন কে ওর ডান হাতটা ধরল। মোটু এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে গেল। শান্ত বলে উঠল–'আরে আমি।' আধো অন্ধকারে শান্তকে দেখে মোটু আশ্বস্ত হলো। ওদিকে শান্তও তখন একটু একটু হাঁপাচ্ছে। বলল–'তুই ছুটে পালিয়ে এলি কেন?'

'আর কেন?' মোটু বসতে বসতে বলল। তারপর বটেশ্বরের ব্যাপারটা বলল।

'তুই জুতোটা ফেলে এলি?' শান্ত বলল।

'আর জুতো–তখন পড়িমরি করে পালাতে পারলে বাঁচি।'

মোটু বলল।

'তুই একটা বুদ্ধু। বটেশ্বরকে একটা স্লু দিয়ে এলি তো।' শান্ত বলল।

'ঐ জুতো নয়। অন্য জুতোগুলো খুঁজতে হবে।' মোটু বলল।

শান্ত উঠে দাঁড়াল। বলল–'ওঠ্, চল্।'

'আবার?' মোটু বলল–'বটেশ্বর যদি–'

'বটেশ্বর আর ওখানে নেই। ওকে থানার দিকে যেতে দেখলাম। এখন বোধহয় জুতোর ছাপ মেলাচ্ছে। চল্।' শান্ত বলল।

ওরা যখন শশীবাবুর বাড়ির সামনে এল তখন জ্যোৎস্না অনেকটা উজ্জ্বল হয়েছে। সারা বাড়িতে কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। শশীবাবু আর তাঁর স্ত্রী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

মোটু আর শান্ত ভালো করে আশপাশ দেখল। দেয়ালের আড়াল, গাছটাছের আড়াল। বলা যায় না–বটেশ্বর লুকিয়ে থাকতে পারে। সব দেখে বুঝল বটেশ্বর এ তল্লাটে নেই।

দু'জনে দেয়াল ডিঙোল। সাবধানে বাগান পেরিয়ে দরজার কাছে এল। সকালে এই দরজা দিয়েই ওরা ঢুকেছিল। দরজা আধ-ভেজানো। দু'জনেই খুশি। এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল। দরজা খুলে ঢুকল দু'জনে। মোটু পেন্সিল টর্চ জ্বালল। শান্তও পকেট থেকে একটা ছোট্ট টর্চ বার করল। মোটু ফিস্‌ফিস্ করে বলল–'আমি আলনার নিচে দেখছি। তুই পড়ার ঘরটা খুঁজে দেখ্ রাবার সোলঅলা জুতো পাস্ কিনা।'

দু'জন দু'দিকে চলে গেল। মোটু আলনার কাছে এল। আলনায় শশীবাবুর জামাপ্যান্ট, কোট, সোয়েটার ঝুলছে। মোটু টর্চের আলো আলনার নিচে ফেলে জুতো খুঁজতে লাগল। সার সার তিন জোড়া বুটজুতো আর একটা বুট। জোড়ার অন্যটা তো বটেশ্বরের কাছে। সকালে এই জুতোগুলোই দেখেছে। তবু আর একবার উলটে-পালটে দেখল। নাঃ সব ক'টার সোলই চামড়ার। আশ্চর্য একটাও চটি নেই। লোকটা কি বাড়ির মধ্যেও বুট পরে থাকে!

তখনই মোটুর কানে এল জুতো ঘষার খুব মৃদু শব্দ। ও তাড়াতাড়ি ঝোলানো কোটপ্যান্টের আড়ালে চলে গেল। অন্ধকারে খুব অস্পষ্ট দেখল একটা ছায়ামূর্তি পড়ার ঘরের দিকে যাচ্ছে। মোটু চমকে উঠল–আবার বটেশ্বর?

ওদিকে শান্ত টর্চের আলো ফেলে তন্নতন্ন করে পড়ার ঘরের মেঝেয় খুঁজছে। একটা চেয়ারের নিচে পেল একজোড়া বুট। শান্ত দ্রুত একটা বুট তুলে নিল। টর্চের আলো ফেলল। নাঃ, সোলটা চামড়ার। জুতোটা রাখতে যাবে তখনই হঠাৎ ঘরের আলো জ্বলে উঠল। শান্ত আরো নিচু হলো। শশীবাবু নাকি গলায় চিৎকার করে উঠলেন–'চোর–ডাকাত–পুলিশ। শীগ্‌গির এসো–থানায় ফোন করো।'

শান্ত দ্রুত ওঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল–'স্যার, আমরা চোর-ডাকাত নই।'

'এ্যাঁ?' শশীবাবু কাছে এগিয়ে এলেন। নাকের ডগায় নেমে আসা চশমাটা ঠেলে তুললেন–'ও, তুমি? তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি!'

'আজ্ঞে আজ বিকেলেই আমি এসেছিলাম।' শান্ত দ্রুত বলে উঠল।

ওদিকে শশীবাবুর চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে শোবার ঘর থেকে শশীবাবুর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। অন্ধকারে ছুটে আসতে গিয়ে এ ঘরে আলনার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। আলনাসুদ্ধ মোটু আর শশীবাবুর স্ত্রী মেঝের ওপর পড়লেন। মোটুর ছড়ে-যাওয়া হাতে আলনার স্ট্যান্ডটা এসে লাগল। মোটু চিৎকার করে উঠল–'গেলাম রে–।'

শশীবাবুর স্ত্রী তার চেয়েও জোরে চিৎকার করে উঠলেন–'ডাকাত–ডাকাত–মেরে ফেলল।'

শশীবাবু ছুটে এসে এ ঘরের লাইট জ্বাললেন। দেখা গেল ছাত্রাকার প্যান্ট-জামার মধ্যে তাঁর স্ত্রী পড়ে আছেন। মোটু অবশ্য তখন উঠে বসেছে। শশীবাবু নাকি সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন–'এ্যাঁ–আর একটা? পুলিশ–পুলিশ–। শীগ্‌গির থানায় ফোন করো।'

মোটু তড়াক করে উঠে দাঁড়াল–হাতজোড় করে বলল–'দোহাই–পুলিশ ডাকবেন না। সব বলছি আপনাকে।'

শশীবাবুর চশমা যথারীতি নাকের ডগায় চলে এসেছিল। মোটুর কাছে এসে চশমাটা ঠেলে তুললেন। মোটুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন–'তোমাকেও তো চেনা চেনা লাগছে। তোমরা দু'জনে আজ বিকেলে আমার বাড়ি এসেছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' মোটু ঘাড় নেড়ে বলল।

শশীবাবুর স্ত্রী ততক্ষণে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মোটুকে দেখে বললেন–'এ তো বাচ্চা ছেলে।'

'হ্যাঁ, আর একটাকে পড়ার ঘরে আটকে রেখেছি। দুটোকেই পুলিশে হ্যান্ড ওভার করবো।' মোটুর দিকে তাকিয়ে বললেন–'এ্যাই–চলো পড়ার ঘরে।'

[চলবে]

ছবিঃ দিলীপ দাস

একটি সত্য ঘটনা

জেঠুর বাঘ মারা

কান্তিলাল কোলে

আমার বাবার মামার বাড়ি গরলগাছায়। কোলকাতার খুব কাছে। এক পল্লীগ্রাম। মাটির রাস্তা–চারদিকে বনবাদাড় বাঁশবন। বড় পুকুর, ছোট ডোবা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। আগে সেখানে ছোট্ট রেলগাড়িও চলতো। স্টেশানের নাম ছিল কালীপুর।

আমি আর দিদি বাবার সংগে গরমের ছুটিতে টাটা থেকে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাগানে আম, জাম, লিচু, জামরুল, কলা, নারকেল, ফলসা সব হয়ে রয়েছে। বড় বাগান খুব নির্জন, কি রকম যেন ভয় ভয় করতো। দিনের বেলাতেও ঝিঁঝি ডাকতো। বাড়িটা লাল রঙের, তিনতলা, খুব বড়। পেছন দিকটা ছিল জংগল। বাঁশবন, তেঁতুল গাছ আর মাঝে মাঝে নারকেল গাছে ভরা।

একদিন বাবা বললো, এদিকে আয়, একটা জিনিস দেখাবো। বাবা একটা ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। দেখি, সামনেই একটা বিরাট বাঘ দাঁড়িয়ে। তার চোখগুলো জ্বল জ্বল করছে। মুখ হাঁ করে যেন তেড়ে আসছে। আমি তো ভয়ে দিদির পেছনে লুকোলাম। বাবা বললো, ভয় নেই রে, এটা জ্যান্ত নয়, মরা। বাবা বাঘটার গায়ে হাত দিয়ে বললো, বাঘটা কে মেরেছে জানিস? যে জেঠু টাটাতে গিয়েছিল, সেই জেঠুই মেরেছে। তবে শোন সেই গল্প।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। এখানে তখন চারদিকে গভীর ঘন বন-জংগল ছিল। শীতকাল, বড়দিনের ছুটি। প্রতিবারের মতো সেবারও মামার বাড়িতে এসেছি ছুটি কাটাতে। প্রায়দিনই ভোরবেলায় বন্দুক নিয়ে মামাতো দাদার সংগে পাখি

মারতে যেতাম। বনে-জংগলে পাখি মেরে ফিরতাম দুপুরবেলায়। ফিরেই খুব বকুনি খেতাম দিদির কাছে।

একদিন আমাদের পাখি মারতে যাওয়া বন্ধ হলো। কেন না, বাঘ বেরিয়েছে! কেউ দেখেনি। কিন্তু এর ওর গোয়ালে গরু মেরেছে। কারো বাছুর বা ছাগল তুলে নিয়ে গেছে।

গ্রামের লোক সব ভয়ে জড়সড়। রাতে বড় কেউ বের হয় না। সন্ধ্যের পরই সব রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়। নানান লোকে নানান কথা বলে। কেউ বলে–ইয়া বড়, ২৫।৩০ হাত হবে। কেউ বলে, আরো খানিকটা বড়। কেউ বলে, গায়ে চাকা চাকা দাগ। কেউ বলে, ডোরা কাটা!

রবিবার চার পাঁচজন লোক মামার বাড়ির সামনে এসে হৈচৈ লাগিয়ে দিল। তারা খুব উত্তেজিত। খান্‌পুরের জংগলে নাকি সকালেই বাঘ দেখা গেছে। তাই বাবুদের বন্দুক নিয়ে এখনই যেতে হবে।

হারুদা বন্দুক নিয়ে লুঙ্গি পরেই বেরিয়ে পড়লো। তার বন্ধু বাঁটুদাও বন্দুক নিয়ে হারুদার সঙ্গে চললো। দেখতে দেখতে এ-পাড়ার ও-পাড়ার লোকেরাও বাঘ মারতে যাওয়ার মিছিলে যোগ দিল। তাড়াহুড়োতে তারা হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিয়েই চলেছে। কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে কাটারি, বঁটি। এমনকি বেলুন, ঝাঁটা, খালি টিন পর্যন্তও নিয়ে চলেছে বাঘ মারতে। বাঘ যেন একটা ইঁদুর বা ছুঁচো। আসলে বাঘ সম্পর্কে ভালোরকম ধারণাটুকুও নেই কারো। তবে তারা সংখ্যায় অনেক, ষাট সত্তর জনেরও বেশি।

খান্‌পুরের জঙ্গলের আশপাশে লোকজনের বাসটাস নেই। খালি পোড়ো জলাজমি। মাঝে মাঝে মজে যাওয়া পুকুর ডোবা আর উলুঘাসের জঙ্গল। উলু-ঘাসগুলো এক মানুষের চেয়ে বেশি লম্বা। তাই দুহাতে দুদিকে সরাতে সরাতে লাইন দিয়ে সবাই চলেছে বাঘের খোঁজে–নিঃশব্দে।

বাঘমশাই তো দিব্যি আরামে উলুঘাসের জঙ্গলে শুয়ে শীতের সকালে রোদ পোয়াচ্ছিল। কিছু লোক বাঘটার পাশ দিয়েই বাঘটাকে পেরিয়ে গেছে। কিন্তু নিতাইয়ের একটা পা হঠাৎ পড়ে গেছে বাঘটার লেজের ওপরে। ব্যাস্, আর যায় কোথায়। বাঘ আঁক্ করে দু'পায়ে লাফিয়ে উঠে দু'হাত দিয়ে নিতাইকে জাপটে ধরে বাঁ কাঁধে বসিয়ে দিয়েছে এক কামড়।

নিতাইয়েরও পালোয়ানী শরীর। মালকোঁচা করে কাপড় পরা, খালি গা, হাতে ছিল একটা লাঠি। সেও লাঠি ফেলে ধরেছে বাঘটাকে আচ্ছাসে জাপটে। চললো দুজনে জাপটা-জাপটি, লড়ালড়ি।

সবাই তখন বাঘ বাঘ করে চেঁচাচ্ছে। বাঁটুদা হারুদা বন্দুক হাতে হাজির। কিন্তু কাকে গুলি করবে? একবার নিতাই নিচে, বাঘ ওপরে, আবার পরমুহূর্তেই নিতাই বাঘকে নিচে ফেলে উপরে উঠে পড়েছে। মুশকিল ব্যাপার! বাঘকে গুলি করতে গিয়ে যদি নিতাইয়ের গায়ে লেগে যায়!

বাঁটুদা তো শেষ পর্যন্ত বন্দুকের নল ওপরদিকে করেই আকাশে গুলি চালালো। তাতেই ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। বাঘটা বন্দুকের গুলির প্রচন্ড আওয়াজে ভয় পেয়ে নিতাইকে ছেড়ে দিয়ে এক লাফে সকলের চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিতাই 'জল জল' করে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। কিন্তু কোথায় জল। বড় বড় উলু ঘাসের মাঝে কোনদিকে পুকুর বোঝাই যাচ্ছিল না। বাঘকে সামনে চোখে দেখার পর সব ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কেউ সেখান থেকে নড়তেই চাইছিল না। হারুদা বাঁটুদা ধমক দিতে, দল বেঁধে কিছু লোক এদিকে, কিছু লোক ওদিকে জলের খোঁজে গেল। কাউকেই বেশি দূরে যেতে হলো না। একটু এগুতেই দেখা গেল একটা ছোট ডোবা। তাতে শুধু পাঁক। জল প্রায় নেই বললেই চলে। ডোবাটার ধারে যেতেই সবাই আবার একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো 'বাঘ, বাঘ'।

বন্দুক হাতে হারুদা এক দৌড়ে সেখানে পৌছালো। দেখে গুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে বাঘটা লাফ দিয়ে ডোবার পাঁকের মধ্যে পড়ে আটকে গেছে। আর পাঁক থেকে বেরুতে পারছে না।

হারুদার দোনলা বন্দুকের দুটো গুলিতেই বাঘটা পাঁকের ওপরই নেতিয়ে পড়লো।

নিতাইকে কোলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলো।

বাঘটাকে বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে অনেক লোক মিলে কাঁধে করে এনে মামাদের বাড়ির সামনে অশ্বত্থতলায় নামালো। বিরাট বাঘ, প্রায় সাত হাত লম্বা। বাড়ির সামনে বাঘ দেখতে এত ভিড় শুরু হলো যে গ্রামের দুর্গাপুজোতেও এমন ভিড় বড় দেখা যায় না।

গ্রামের ছেলে শঙ্কর নতুন ক্যামেরা কিনেছে–তাকে খবর দেওয়া হলো ফটো তোলার জন্যে। বাঘের দড়িদাড়া খুলে তাকে হাত পা ছড়িয়ে শোয়ানো হলো। তার মাথার তলায় একটা থান ইট দিয়ে মাথাটাকে খাড়া করা হলো। বাঘের পেছনে ছোট ছেলেমেয়েরা সারি দিয়ে বসলো। তার পেছনে যারা বাঘ মারতে গেছিলো তারা বসলো। তাদের পেছনে ঠিক মাঝখানে হারুদা বন্দুক হাতে খুব ভারিক্কি চালে দাঁড়ালো। ছবি তোলা হয়ে গেল। যারা দাঁড়াতে পেল না তাদের মুখ কাঁদ-কাঁদ হয়ে গেল।

দুদিন বাদেই ছবি এসে গেল কোলকাতা থেকে। সবাই বললো, কি ভালো ছবি! বাঘের কি দারুণ ছবি!! সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেবল একজনের মুখ ভার, হারুদার। কি ব্যাপার? ছবি দেখে আমার তো চক্ষু ছানাবড়া। হারুদার মুখই বাদ গলা থেকে।

বিঃ দ্রঃ–

১৯৮১ সালে গরলগাছা হাই স্কুলে হুগলী জেলা বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়। বাঘটা সেখানে দেখানো হয়েছে। ২ মে ১৯৮১ দেশ পত্রিকায় বাঘের ছবিও ছাপা হয়েছে। সঙ্গে হারুদার নামও উল্লেখ আছে।

ছবি ঃ সুফি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সব্যসাচী

মুর্দাহারুর মুগুর নিয়ে পালাচ্ছে নাংলারা। তাই দেখে মুর্দাহারু চেঁচিয়ে জুডাককে হুকুম করল, 'দৌড়ে যা, ধর ওদের, কেড়ে নে মুগুর।' কিন্তু হুকুম করেই তো সে খালাস। এদিকে জুডাক দৌড়বে কি করে! বোংগা কি তাকে এমন দেহ দিয়েছেন, যা নিয়ে দৌড়োনো যায়? সোজা হয়ে দাঁড়ানোর মতো করেই মহাকপির হাড়গুলো জোড়া দেননি বোংগা। কুঁজো হয়ে ছাড়া দাঁড়াতেই তারা পারে না। তবু শত্রুর কাতর মিনতি শুনে সে চেষ্টা করল দৌড়ে গিয়ে মুগুর কেড়ে নেওয়ার। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বুড়ো হলেও নাংলারা দৌড়তে পারে। কারণ তারা কপি নয়, মানুষ। জুডাক পর পর কয়েক বার আছাড় খেলো—তারপর 'পারছি না'—জাতীয় একটা ওজর দেখিয়ে বসে পড়ল আছাড়ের ব্যথা কমাবার জন্য।

নাংলাকাংলা তো শত্রুপুরী। তার ভিতর দিয়ে ভুলাং-টুলাংয়ে ফেরার চেষ্টা করা সমীচীন হবে কিনা, মুর্দাহারু ঠিক বুঝতে পারছে না। নিজে সুস্থ থাকলে, বোংগার মুগুর হাতে থাকলে, শত্রুর শত্রু এই হাঁদারাম মহাকপিটা সংগে থাকলে, মুর্দাহারু হয়তো সাহস করত নাংলায় ঢুকতে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায়? না, না, দুঃসাহসে অমন কাজ করে দরকার নেই।

অতএব, নাংলারা সোজা পথে নিজেদের ঘরে ফিরছে, মুর্দাহারু ভুলাংয়ে ফিরছে ঘুরপথে, আর ট্যান্টরের পিঠে চেপে সেইমুণ্ডা আর টারজান তখন সবে সেই পরিত্যক্ত টিলার নিচে এসে পৌছেচে।

টারজান এসে ট্যান্টরের শুঁড় বেয়ে উঠল যখন, সেইমুণ্ডা লজ্জিতভাবে বলল, 'এক হাল্কা নিমন্ত্রণের পাল্লায় পড়ে খুব ভোগান্তি হলো তোমার।'

টারজান গম্ভীর। 'আমার ভোগান্তি যতই হোক, তার জন্য চিন্তা করো না। তুমি নাংলা থেকে বেরিয়ে এসে ভাল করোনি। যতদূর জানি, ওখানে রাজাগিরির দাবিদার আছে দুই পরিবার। তোমরা হলে জাম্বাশুম্বার বংশ, যার নায়কত্বে আছ তুমি এখন। অন্য বংশ হলো আহুসমুণ্ডার। তার নাবালক ভাই কারকুণ্ডাকে গদিতে বসাবার একটা জল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে। এ-সময়ে গ্রাম ছেড়ে আসা—

'তোমাকে খুঁজতেই বেরিয়েছিলাম'—বলল সেইমুণ্ডা—'মাঝখানে পেলাম একটা পাতালকূপ, একটা সুড়ংগ, টিলার গায়ে সিংহ, কী নয়?'

প্রশ্ন করে করে সেইমুণ্ডার কাহিনী সংক্ষেপে শুনে নিল টারজান। 'এই টিলা? সুড়ংগ এর তলাতেই আছে?'—জিজ্ঞাসা করল ফেরা-পথে—'ঐতো সিংহ মরে পড়ে আছে ট্যান্টরের পায়ের চাপে।'

'পাশ দিয়ে চলে যাব, অথচ এই পথের রহস্যপুরীটা একবার দেখে যাব না?'—সেইমুণ্ডার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল টারজান।

সেইমুণ্ডা বলল, 'নাংলাকাংলায় কী হচ্ছে এতক্ষণ,

নারিহালদের উপরে বিশ্বাস নেই আমার–'

'নাংলাকাংলায় যা-খুশি হোক, আমি তো আছি। সব ঠিক হয়ে যাবে'–উত্তর দিল টারজান।

অন্যরকম আপত্তিও আছে সেইমুণ্ডার, 'একটা সিংহ মরেছে। দৈবাৎই মারা পড়েছে বলতে হবে। আর একটা সিংহ যদি দেখা দেয়, লাফাতে গিয়ে সে যদি ট্যান্টরের পায়ের কাছে না পড়ে পিঠের উপর পড়ে–'

টারজান উত্তর দিল, 'যেখানে খুশি পড়ুক। আমি তো আছি–'

আর কোনো আপত্তি তুলল না সেইমুণ্ডা।

ট্যান্টর থামল। ঠিক সেইখানেই থামল, যেখানে মরা সিংহটা পড়ে আছে টিলার নিচে। আকাশে স্কা (শকুনি) উড়ছে। দুই দণ্ড বাদে খানকতক হাড় ছাড়া ওখানে আর কিছুই পড়ে থাকবে না পশুরাজের।

টারজান কথা কইছে হস্তিভাষায়। ট্যান্টর মাথা নাড়ছে মাঝে মাঝে। টারজান আর সেইমুণ্ডা টিলায় উঠতে চাইছে আবার। ঢুকতে চাইছে সুড়ংগে। বেরুতে চাইছে পাতালকূপের মুখ দিয়ে। কোনোটাই পছন্দ নয় ট্যান্টরের। কারণ, প্রস্তাবটার প্রতি পর্যায়ে জীবন সংশয় ঘটবার আশংকা। 'তার চেয়ে আরামে পিঠে বসে আছ। তাই থাক না বেরাদার! আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে দেব নাংলায়'–এই বলে সে দস্তুরমতো বিদ্রোহ করে বসল।

'শুধু ঠিক সময়ে পৌঁছে দিলে হবে না'–বলল টারজান–'যে-রাস্তায় পৌঁছে দিচ্ছ, সেটাও হওয়া চাই ঠিক রাস্তা। তা আমার ঠিক রাস্তা আজকে হলো সুড়ংগপথ পাতালকূপের মধ্যে দিয়ে।'

ট্যান্টর দ্বিতীয়বার আপত্তি করার সাহস পেল না। টারজান আর সেইমুণ্ডা নেমে পড়ল টিলার গায়ে। ট্যান্টরকে টারজান নির্দেশ দিল, 'পাতালকূপের মুখেই তুমি অপেক্ষা করো গিয়ে। আমরা সুড়ংগ আর কূপ দেখেশুনে ঠিক পৌঁছে যাব তোমার কাছে।'

আগে আগে সেইমুণ্ডা, কারণ সে আগে একবার ঘুরে গিয়েছে এসব জায়গা। টিলার গায়ে গায়ে। কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই। এইখানটাতেই টিলার চূড়া বলা যেতে পারে। ডাইনে সুড়ংগমুখ, টিলার মাঝামাঝি উচ্চতায়। সেখান থেকে ধাপে ধাপে নেমে পুব-প্রান্তে সমতলে পরিণত হয়েছে।

সুড়ংগমুখটা অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল টারজান।

তারপর সেইমুণ্ডাকে ভিতরে ঢুকতে বলে নিজে কুড়োতে লাগল বড় বড় সব চাঙড়। একটার উপরে আর একটা সাজিয়ে সেইসব চাঙড় দিয়ে মজবুত করে বন্ধ করে দিল সুড়ংগপথটা। 'দরকার কী খুলে রাখবার? জুডাক যদি মুর্দাহারুর দিকে ঢলে পড়ে, তাকে তার দল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখাই আমাদের দরকার হবে। তা, বিচ্ছেদটা অন্ততঃ আধাআধি রকম পাকাপোক্ত হলো না? এই সুড়ংগমুখ বন্ধ করার দরুন? এর মধ্যে এমন সব চাঙড় রইল, যা জুডাকের দলের কোনো মহাকপিরই সাধ্য হবে না নাড়াতে। আর একসংগে হাত মিলিয়ে অনেকে যে টানাটানি করবে, তারও উপায় নেই এখানে। একজনের বেশি দু'জনের পাশাপাশি দাঁড়াবার জায়গাই নেই।'

আগে আগে সেইমুণ্ডা, কারণ সে একবার এসে গিয়েছে এখানে। সেইমুণ্ডা দেখিয়ে দিল, মারাত্মক রকমে জখম হয়ে মুর্দাহারু কোথায় এসে লুকিয়েছিল।

'ওর উপর তোমার দয়া হয়?'–হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল টারজান।

গোমাংগানিদের দোষ অনেক আছে, কিন্তু টারমাংগানিদের চাইতে একদিক দিয়ে তারা অনেক উঁচুতে। মিথ্যা কথা তারা বলে না। সেইমুণ্ডাও সত্য কথাই বলল, 'দয়া কেন, শ্রদ্ধাই হয়। অত বড় বীর তো আমাদের সমাজে আর নেই। তুমি অবশ্য তাকেও যুদ্ধে হারিয়েছে, কিন্তু এ কথা তুমিও অস্বীকার করতে পারবে না যে হাতে ভোজালি না থাকলে তুমিও তাকে কায়দা করতে পারতে না বোধহয়।'

টারজান উত্তর দেবার সময় পেল না। কথায় কথায় তারা পাতালকূপে এসে পড়েছে।

জুডাকের ধাক্কায় কূপের নিম্নাংশের দেয়াল বসে গিয়েছিল, সেখানে দেখা দিয়েছিল একটা দ্বারপথ। সে-দ্বার এখনো তেমনি খোলা পড়ে আছে। 'চলো, এদিকটা দেখে আসি'–বলল টারজান।

অনুমান ত্রিশ ফুট গভীর এই কূপটা।

তবু কী খটখটে শুকনো এর তলা! উত্তরের দেয়ালের নীচে গজানো এই ফাঁকটা, এর খাড়াই আপাততঃ তিন ফুটের বেশী নয়। এ-ফাঁক যে প্রয়োজনমতো বাড়িয়ে নেওয়া যায়, তিনের জায়গায় করা যায় ত্রিশ ফুটও, সে কথা মুর্দাহারু জানে। জুডাকও জানে। কারণ তারা চাক্ষুষ দেখেছে। কিন্তু টারজান দেখেনি, দেখেনি সেইমুণ্ডাও। এরা যা দেখছে, তা মাত্রই তিন ফুটের প্রসার।

টারজান বলল–"আমি আগে ঢুকব। সবকিছু নিরাপদ দেখলে তবেই তোমাকে ডাকব।"

"তোমারই বা ঢোকার দরকার কি?"–সেইমুণ্ডার কথার সুরে নিষেধের মিনতি। দেয়ালের গায়ে ঐ বাড়ন্ত পাথরখানায় ঝুলে পড়লে এই পাথর হয়ত উপরে উঠতেও পারে। চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

"এখানকার রহস্যটা না দেখে? বেরুবার জন্য ব্যস্ত কী? পাথর না ওঠে যদি, তাতেও আমাদের ওঠা বন্ধ হবে না। তোমাকে পিঠে নিয়ে আমি কাঠবেড়ালের মতো উঠে যাব এই দেয়াল বেয়ে।"

"ব-ল কী?"–দুই চোখ ছানাবড়া সেইমুণ্ডার।

কিন্তু ও প্রসংগে কথা আর বাড়তে পেলো না। কোথা থেকে একটা গুমগুম আওয়াজ আসছে। টারজান কয়েক মুহূর্ত কান পেতে শুনল সেই আওয়াজ, তারপর বলল–"আওয়াজটা

ওপিঠ থেকেই আসছে। কী হচ্ছে ওদিকে, না-দেখে আমি যাব না। তোমাকে আমি উপরেও রেখে আসতে পারি, বা সঙ্গে নিয়েও ওপিঠে যেতে পারি। তোমার কোনটা পছন্দ, বল।"

সেইমুণ্ডা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল–"তোমার সঙ্গেই যাব। আমার দেশের ভিতর কোনো জায়গায় যদি অজানা রহস্য কিছু থাকে, সেই রহস্য ভেদ করা তো আমারই দায়িত্ব! তোমার সাহায্য পাচ্ছি, এটা তো আমার সৌভাগ্য! সব ঝক্কি তোমার উপর ফেলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্দি হয়ে থাকি কেমন করে?"

আর কথা না বলে টারজান দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ওপিঠে চলে গেল, এবং এক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাতছানি দিল সেইমুণ্ডাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেইমুণ্ডাও চলে গেল ও পিঠে।

গিয়েই বিস্ময়ে হতবাক! একটা দরজা মাত্র! তার দুই পিঠের প্রাকৃতিক দৃশ্যে এমন বিপুল পার্থক্য থাকতে পারে? নাংলাকাংলা থেকে এই ভাঙা ঢিবির পাতালকূপ পর্যন্ত গোটা পথটাই অসুন্দর; ন্যাড়া পাহাড়, রুক্ষ মাটি, ছোট ছোট কাঁটাওয়ালা গাছের প্রাচুর্যে যে কোনো মানুষের তা অরুচিকর হতে বাধ্য। কিন্তু এ পিঠে?

আশ্চর্য পরিবর্তন!

না পাহাড়, না কাঁটাবন, এমন কিছু না, যাতে বিতৃষ্ণার সঞ্চার হতে পারে মানুষের মনে। সমতল মাঠ, তার এক কোণে একটা ফোয়ারা থেকে জল উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আর সেই জল এক ছোট্ট জলাশয়ে সঞ্চিত হয়ে তা থেকে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে শীর্ণা এক নদীর আকারে। ফলে গোটা মাঠখানা সবুজ মখমলের মতো মসৃণ, নয়নমনোহর। মাঠের চারিপাশে সুশ্যাম অরণ্য, বৃহৎ বনস্পতিদের মাথা উঠেছে ও পিঠের টিলার শীর্ষ ছাড়িয়ে।

সেই গুমগুম আওয়াজ!

এক কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ পুরুষ কী যেন কুটছে উদূখলে। উদূখলের গর্তটাও পাথরের বুকে, মুষলও পাথরের। দুই পাথরের সংঘাতের ফলেই ঐ শব্দ। আরও একটা জিনিস দেখতে বাকী ছিল তখনও। ফোয়ারার জল যেখানে ধারায় নামছে জলাশয়ে, সেইখানে উৎক্ষিপ্ত শিকরমালার আড়ালে প্রস্তরাসনে বসে আছেন শ্বেতশ্মশ্রু, শ্বেত জটাজূট এক দেদীপ্যমান বৃদ্ধ, গৌর না হলেও যাঁর গায়ের রঙকে কালো কখনো বলা যায় না। সেই বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সেইমুণ্ডা যেন যুগপৎ উৎফুল্ল এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ফিসফিস করে টারজানকে বলল–"এক অতি উঁচুদরের ডাইনের গল্প আমাদের দেশে লোকের মুখে মুখে ফেরে। তিন কালের সব কথাই নাকি তিনি জানেন। বোঙ্গার নাকি অতি কাছের মানুষ তিনি। মুর্দাহারুকে বোঙ্গার সাধনায় তিনিই নাকি দীক্ষা দিয়েছিলেন। ইনি যদি তিনিই হন–সাধারণ ডাইনদের মতো বুজরুকি তিনি দেখান না, হাড়ের মালা-টালা পরেন না। হ্যাঁ, ইনিই বোধহয় তিনি, আমাদের বরাত ভাল। নাম এঁর বিরঙ্গ।"

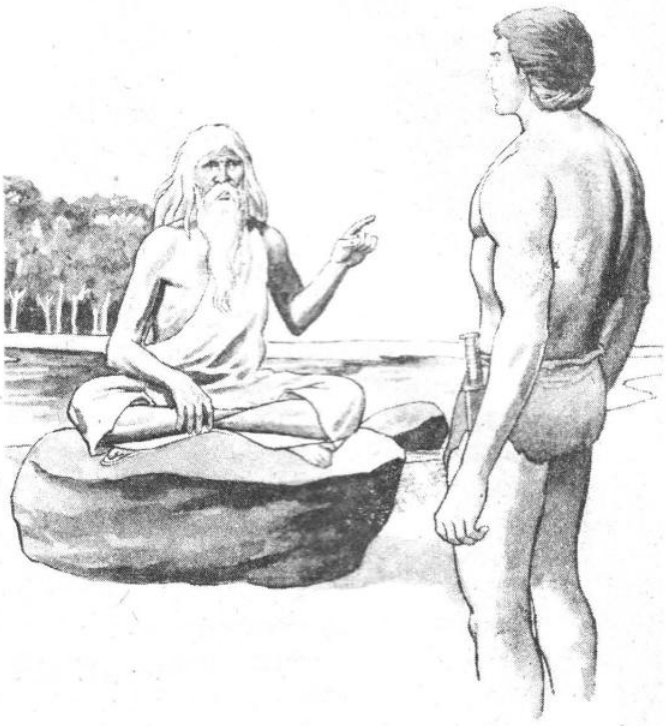

কি নাম বললে সেই বিদ্যাটার?

কথা বলতে বলতেই এগিয়ে গিয়েছে সেইমুণ্ডা, এবং বৃদ্ধের ঠিক সামনে হাঁটু ভেঙে বসেছে। টারজান অদূরে দাঁড়িয়ে আছে, ওভাবে বসা তার অভ্যাস নেই, কিন্তু বৃদ্ধের প্রতি সম্মানের কোনো অভাব যে নেই তার মনে, তা তার দাঁড়াবার ভঙ্গী থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে।

আশ্চর্য! নাম ধরেই সেইমুণ্ডাকে সম্বোধন করলেন বৃদ্ধ–সেইমুণ্ডার নিজের ভাষাতেই করলেন, যে-ভাষা ইতিমধ্যে টারজানও একটু-আধটু বুঝতে ও বলতে শিখেছে–"তুমি কাংলারানী সেইমুণ্ডা, বটে তো? হ্যাঁ, আমি সেই ডাইন-ঠাকুর্দা বিরঙ্গ, যার কথা তোমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনেছ। আমার অন্য অন্য ক্রিয়াকাণ্ডের কথা চাপাই থাকুক, তোমার এবং ঐ বিদেশী পুরুষের এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে মুর্দাহারুকে বোঙ্গার তপস্যা করার উপদেশ আমিই দিয়েছিলাম, সে-তপস্যার পদ্ধতিও আমিই বলে দিয়েছিলাম। কিন্তু দৈত্যদানো রাক্ষসদের সচরাচর যা হয় আর কি, অহংকার বেশী ওদের, বোঙ্গার কৃপা ছিটেফোঁটা লাভ করলেই মনে করে সে বোঙ্গারই সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। আমি ওকে স্পষ্ট বলেছিলাম, ওকে তপস্যা করতে হবে দীর্ঘদিন। দুই কিস্তিতে। মাত্র তিন বৎসর সাধনার ফলেই সে বর পাবে বোঙ্গার, যা খুশী বর চাইবে, তাই-ই পাবে। কিন্তু বর দেওয়ার সময়ে বোঙ্গা দর্শন তাকে দেবেন না, শুধু তাঁর বাণীটুকু অন্তরাল থেকে শুনেই

তাকে তুষ্ট হতে হবে তখনকার মতো।

"হ্যাঁ, তখনকার মতো, চিরদিনের মতো নয়। আমি তাকে স্পষ্টই বলেছিলাম–প্রথম কিস্তির সাধনা শেষ হলেই একটা বর সে পাবে বটে, কিন্তু চূড়ান্ত বর সেটা নয়। চূড়ান্ত বর পেতে হলে তাকে বসতে হবে দ্বিতীয় কিস্তি সাধনায়, আরও তিন বছর। সে-তপস্যায় সফল হলে তবেই সেই বর চিরদিন ভোগ করার যোগ্যতা অর্জন করত। সেটা আর মুর্দাহারু করেনি। বর পেয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ভুলাংটুলাংদের প্রভুত্ব সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য।

"যা হোক, মুর্দাহারু ভুল করেছিল। যোগ্যতা বজায় রাখা তো পরের কথা, যোগ্যতা পুরোপুরি অর্জনই সে করেনি। তার আগেই বেরিয়ে পড়ল দিগ্বিজয়ে। তার ফল হলো মারাত্মক। সে পরাজিত হলো এক বিদেশী শক্তিমানের কাছে। তবুও তার অহংকার কাটেনি। প্রমাণ চাও? ঐ যে দরজাটা খোলা রয়েছে! ঐ দরজা দিয়ে তোমরা দুজন চলে এলে আমার কাছে। কিন্তু মুর্দাহারুদের সমুখেও খোলাই ছিল ঐ দরজা। মুর্দাহারু ঢোকেনি এখানে। সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ভুলাং ফিরে যাওয়ার জন্য।"

সেইমুণ্ডা, এ কি মুর্দাহারুর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বৈরী কাংলা-রানী সেইমুণ্ডা, না অন্য কেউ? সে আবেগের সংগে বলে উঠল–"মুর্দাহারুর মনের এই মোহ আপনিই কাটিয়ে দিন প্রভু! তাকে আবার তপস্যায় নিযুক্ত করুন। বোংগার চূড়ান্ত, চিরস্থায়ী বর পেয়ে সে বিশ্বজয়ী হোক।"

বৃদ্ধ ডাইন হাসলেন–"তুমি এই কথা বলছ কন্যা? সে না তোমার শত্রু?"

"শত্রু? ততক্ষণই শত্রু, যতক্ষণ সে ক্ষুদ্র উপজাতি ভুলাংদের নায়ক, আর আমি ক্ষুদ্র উপজাতি কাংলাদের নেত্রী। এ-শত্রুতার কোনো ভিত্তি থাকবে না, ভুলাং আর কাংলা যেদিন মিশে এক হয়ে যাবে এক নিখিল কাফ্রী সংঘের ভিতরে।"

এবারে ত্রিকালদর্শী ঋষিও আবেগে ভেসে গেলেন। হাত তুলে তিনি আশীর্বাদ করলেন সেইমুণ্ডাকে। "ঐ যে উদ্‌খলে একটা জিনিস কোটা হচ্ছে, ও হলো মৃতসঞ্জীবনী সুধা। মুর্দাহারু এখনো মরেনি, তা ঠিক। কিন্তু মরবে সে নিশ্চয়ই, যদি না এখনো ঐ অব্যর্থ ওষুধ তাকে সেবন করানো হয়। সে নিজে এসেছিল আমার দোরগোড়ায়, অথচ ভিতরে আসেনি, দরজা খোলা দেখেও আসেনি। কাজেই তৈরী ওষুধও কোনো উপকারে এল না তার।"

ব্যাকুল হয়ে সেইমুণ্ডা বলল–"এখন যদি কেউ নিয়ে যায়, তাকে খাওয়াতে পারে, সে বাঁচতে পারে তো?"

স্থিরদৃষ্টিতে সেইমুণ্ডার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ ডাইন বললেন–"তুমি নিয়ে যাবে? তোমার হাত থেকে সে খাবে, আশা করছ? তার মন যে অহংবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন। সে সন্দেহ করবে যে তুমি বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করছ তাকে।"

"যাতে সন্দেহ না করে, তারও উপায় আপনিই করুন–" মিনতি করে সেইমুণ্ডা।

এতক্ষণে একটা কথা বলল টারজান। অদূরে দাঁড়িয়ে সে ডাইনের সংগে সেইমুণ্ডার আলোচনা শুনছিল। সীমিত ভাষাজ্ঞানের দরুন খুবই অসুবিধা হচ্ছিল বটে বুঝতে, তবু মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল সেইমুণ্ডার উদার দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পেয়ে। এই কাফ্রী মেয়ের মনে এত দেশপ্রেম সঞ্চিত আছে, তা তো টারজান স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। অবজ্ঞায় মেশানো অনুকম্পা, একটা তাচ্ছিল্যের ভাবই সে এ-কয়েকদিন পোষণ করেছে এই কাংলা-রানীর সম্পর্কে।

তাই আজ নিজের কথা শুনে সে নিজেই বিস্মিত হলো–"কাংলা-রানীর কথা যাতে মুর্দাহারু অবিশ্বাস না করে তা আপনি অনায়াসেই করতে পারেন ডাইন! পশ্চিম পৃথিবীতে একজনের চিন্তা বহুদূরস্থ অন্য একজনের মনে সঞ্চারণের ক্ষমতা অনেক সাধুর আছে, শুনেছি। বিদ্যাটার নাম টেলিপ্যাথি। আপনার তা অজানা আছে, এমন ধারণাই আমি করি না।"

ডাইন উত্তর দিলেন, "টেলিপ্যাথি নাম অবশ্য আমি আগে শুনিনি। কিন্তু বিদ্যাটা আমার অল্পস্বল্প জানা আছে। আমি বিদেশী বীরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করছি না। মুর্দাহারুর মনের সন্দেহ আমি নিরসন করব।"

তারপর সেইমুণ্ডার দিকে ফিরে বললেন–"কন্যা, তুমি তাহলে আর কালবিলম্ব করো না। ওষুধ নিয়ে ঘরে ফিরে যাও। মুর্দাহারু তোমার কাংলায়েই আছে এই মুহূর্তে। তার বন্ধু বা রক্ষী হিসাবে যে অপমনুষ্যটি সংগ নিয়েছে তার, কর্তব্য স্থির করতে না পেরে সে নিকটবর্তী অরণ্যের বৃক্ষচূড়ায় আশ্রয় নিয়েছে। বোংগার বরপুত্র এখন কাংলার পথে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কর্মফল আর কী! দ্বিতীয় স্তরের তপস্যা তো সে করেনি! ক্ষমতাই অর্জন করেছে শুধু। শেখেনি উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করতে।"

ডাইনের ইংগিতে কৃষ্ণাংগ পুরুষটি পত্রপুটে করে একতাল ঔষধ এনে দিল সেইমুণ্ডাকে। ডাইন বললেন–"কালবিলম্ব না করে নিজের রাজ্যে চলে যাও, মুর্দাহারুকে সেবন করাও এই ওষুধ। কী নাম বললে, বিদেশী বীর, সেই বিদ্যাটার? যার সাহায্যে একের চিন্তা–"

"টেলিপ্যাথি"–মৃদু হাস্যে উত্তর দিল টারজান।

"টেলিপ্যাথির সাহায্যে আমি তার মনে জাগিয়ে দেব এই ঔষধের উপরে বিশ্বাস। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের তপস্যার প্রয়োজন যে কত বেশী, তার উপলব্ধিও সেই সংগেই জাগবে তার মনে।"

(চলবে)

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

খেলার কথা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

এই লেখা যখন তোমাদের হাতে পৌঁছুবে তখন খেলার জগতের অনেক খবরই বাসি হয়ে যাবে। গড়ের মাঠে লীগের পর শীল্ড, পিকিং এশিয়াড আরও কত কি! বিল্টু-মন্টুদের সেজদাদু ফুটবলের ব্যাপারে খুব রেগে গেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার পিকিং এশিয়াডে ফুটবল দল যাবার অনুমতি দেননি। তাই শুনে সেজদাদুর কি রাগ! বলেছিলেন, ইণ্টারন্যাশনাল এক্সপোজারটার দরকার খুব বেশি। না হলে অভিজ্ঞতা হবে না। তারপর আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই এশিয়াডে দাঁড়িয়েই বলেছিলেন—প্লে গেম ইন দ্য স্পিরিট অফ দ্য গেম। তাছাড়া যে কোনো প্রতিযোগিতায় যোগদান করাটাই আসল, পদক জেতাটা নয়।

এবারের এশিয়াডে ভারতীয় ফুটবল দল হয়তো তেমন ভালো খেলতে পারতো না। তাতে কি? ফিফার হুঁশিয়ারির কথা তো আমাদের ভুলে যাবার কথা নয়। ইতালিতে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার সময় ফিফা-কর্তারা সাফ বলে দিয়েছেন, ভারত যদি এশিয়াড, ওলিম্পিক আর বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্বে না খেলে তাহলে ভারতের ফুটবল সংস্থার অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হবে। এর পরেও সরকার ভারতীয় ফুটবল দলের পিকিংয়ে খেলতে যাওয়া কি করে যে আটকে দিলেন তা বোধগম্য হচ্ছে না। আর সেইজন্যেই সেজদাদু ভীষণ রেগে গেছেন।

দিয়েগো মারাদোনা

ফুটবলের কথা যাক। অ্যাথলেটিকসে ভারত কয়েকটি পদক পেয়েছে। কিন্তু আমরা দ্বিতীয় পি টি উষাকে খুঁজে বের করতে পারছি না। পি টি উষা তো এবার ট্র্যাক থেকে সরে যাবেন। উষা ভারতকে অনেক সোনা-রুপো এনে দিয়েছেন। একাধিকবার এশিয়ার সেরা মহিলা অ্যাথলিটের সম্মান লাভ করেছেন তিনি। কিন্তু উষার পরে কে? এই প্রশ্নটা আমাদের রীতিমতো বিব্রত করে তুলেছে। তবে ভালো লাগছে ভেবে যে বাংলা থেকেও দু-একজন অ্যাথলিট ধীরে ধীরে শিরোনামে আসছেন।

তিন বছর পরে এবার আবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হলো মোহনবাগান। পি কে ব্যানার্জির ভাগ্য, তাঁর ছোটভাই মোহনবাগানের সহকারী কোচ প্রসূন ব্যানার্জির আন্তরিকতা, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রশান্ত ব্যানার্জি, শিশির ঘোষ, কৃষ্ণেন্দু রায়, অচিন্ত্য বেলেল, সত্যজিৎ চ্যাটার্জি, দেবাশিস মুখার্জিদের দক্ষতা ইস্টবেংগলের কাছে ফিরতি খেলায় হেরে পিছিয়ে পড়া

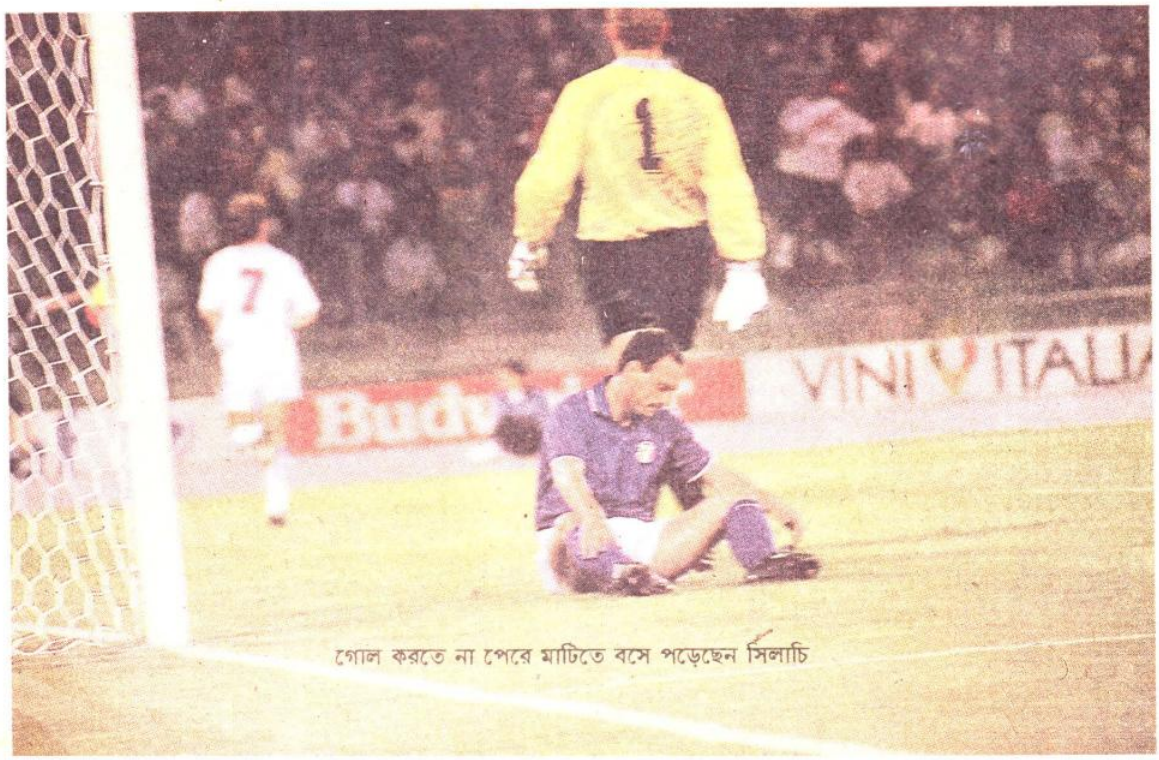

গোল করতে না পেরে মাটিতে বসে পড়েছেন সিলাচি

কপিলদেব

মোহনবাগানকে লীগ চ্যাম্পিয়ন করে দিল। মোহনবাগান ক্লাবের বয়স এখন ১০১ বছর। শোনা যাচ্ছে এই বছরই তারা তাদের শতবার্ষিকী উৎসব পালন করবে। তা সেই বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চয়ই একটা বড় ব্যাপার।

ক্রিকেটে ভারত ইংলন্ডে গিয়ে রাবার হারিয়ে এলো। লর্ডস মাঠে ভারতের ভরাডুবি ঘটেছিলো। ফলে প্রথম টেস্টে হার মানতে হয়েছিলো। দ্বিতীয় আর তৃতীয় টেস্টে ভারত রীতিমতো ভালো খেলেছিলো। তৃতীয় টেস্টে ভারত প্রথমে ব্যাট করে ছ'শর ওপর রান করে ইংলন্ডকে চাপের মুখে ফেলে দিয়ে ফলো অন করায় এবং জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। ভারতের বোলিং শক্তি নেহাতই দুর্বল না হলে তৃতীয় টেস্টে ভারত জিতে যেতো।

তবে দারুণ খেলেছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। বিশেষ করে অধিনায়ক আজহারউদ্দিন, সহ-অধিনায়ক রবি শাস্ত্রী, কপিলদেব, তরুণ খেলোয়াড় শচীন তেন্ডুলকার আর সঞ্জয় দারুণ ব্যাট করেছেন। কপিলদেবের টেস্ট ক্রিকেটে চার বলে চারটি ছয় মেরে বিশ্বরেকর্ড গড়া আর শচীনের সেঞ্চুরি ইংলন্ডের ক্রিকেট অনুরাগীদের মাতিয়ে দিয়েছিলো। সে প্রসঙ্গে আসার আগে আমরা একবার দু'দেশের খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স এবং রানের ও বোলিংয়ের গড় হিসেবের ওপর চোখ বুলিয়ে নিই।

মোহনবাগান দল

ভারত ব্যাটিং

	ম্যাচ	ইনিংস	নঃ আঃ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
আজহারউদ্দিন	৩	৫	0	৪২৬	১৭৯	৮৫.২০
রবি শাস্ত্রী	৩	৫	0	৩৩৬	১৮৭	৬৭.২০
শচীন তেন্ডুলকার	৩	৫	১	২৪৫	১১৯*	৬১.২৫
কপিলদেব	৩	৫	১	২২০	১১০	৫৫.০০
সঞ্জয় মঞ্জরেকার	৩	৫	0	২১৬	৯৩	৪৩.২০
মনোজ প্রভাকর	৩	৫	১	১৩২	৬৭*	৩৩.০০
দিলীপ বেংসরকার	৩	৫	0	১৫৮	৫২	৩১.৬০

ভারত বোলিং

	ওভার	মেডেন	রান	উইঃ	গড়	সেরা
অনিল কুম্বলে	৬০.০০	১০	১৭০	৩	৫৬.৬৬	৩/১০৫
ওয়াসন	৩৭.০	৫	১৭৩	৩	৫৭.৬৬	২/৭৯
কপিলদেব	১২৮.০	২৩	৪৪৫	৭	৬৩.৫৭	২/৬৬
হিরওয়ানি	২১২.০	৪১	৫৮৬	৯	৬৫.১১	৪/১৭৪
সঞ্জীব শর্মা	৪৮.০	৫	১৯৭	৩	৬৫.৬৬	২/৭৫
মনোজ প্রভাকর	১৫৫.০	২৮	৫৫৪	৮	৬৯.২৫	৪/৭৪
রবি শাস্ত্রী	৯৫.৫	৬	৩৪১	২	১৭০.৫০	১/২৯

ব্যাটিং ইংলন্ড

	ম্যাচ	ইনিংস	নঃ আঃ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
রবিন স্মিথ	৩	৬	৪	৩৬১	১২১*	১৮০.৫০
গ্রাহাম গুচ	৩	৬	0	৭৫২	৩৩৩	১২৫.৩৩
ডেভিড গাওয়ার	৩	৬	২	২৯১	১৫৭*	৭২.৭৫
মাইক আর্থারটন	৩	৬	0	৩৭৮	১৩১	৬৩.০০
অ্যালান ল্যাম্ব	৩	৬	0	৩৬৪	১৩১	৬০.৬৬

ইংলন্ড বোলিং

	ওভার	মেডেন	রান	উইঃ	গড়	সেরা
এ ফ্রেজার	১৬১.১	৩৯	৪৬০	১৬	২৮.৭৫	৫/১০৪
ম্যালকম	১১০.০	১৬	৪৩৬	৭	৬২.২৮	২/৬৫

উক্তি

ব্যাটসম্যানরা কথা বলবে তাদের ব্যাট দিয়ে। মুখ দিয়ে নয়। ঠিক তাই করছেন আমাদের আজহারউদ্দিন।

–বিষেণ সিং বেদী

(ইংলন্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে আজহার সেঞ্চুরি করার পর।)

বর্তমান ক্রিকেটের সব থেকে বড় সমস্যা হলো মাঠে খেলোয়াড়দের আচরণ।

–কলিন কাউড্রে

(খেলোয়াড়-আম্পায়ার সম্পর্ক নিয়ে বলতে গিয়ে।)

পাকিস্তানের ওয়াসিম আক্রাম যখন বল করে তখন নন-স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে থাকাটাই যে কোনো ব্যাটসম্যানের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।

–জিমি কুক

(ইংলন্ডের কাউন্টি খেলোয়াড় আক্রামের বলে আউট হবার পর এই কথা বলেন।)

বেদী এমন একজন মানুষ যে ওর সঙ্গে ঝগড়া করতে রুচিতে বাধে।

–সুনীল গাভাসকার

(এম. সি. সি-র সদস্যপদ ছেড়ে দেবার পর বেদীর প্রতিবাদ সম্বন্ধে কিছু বলতে অস্বীকার করে ঐ কথা বলেন।)

চার বছর পরে আর্জেন্টিনার কোচ হিসেবে বিশ্বকাপে যাবার ইচ্ছে আছে।

–দিয়েগো মারাদোনা

(আর্জেন্টিনায় একটি সাক্ষাৎকারে।)

আমায় নিয়ে অনেক লেখালিখি হয়েছে। অনেক বাজে কথাও হয়েছে। তাই আর বেশি কথা বলতে চাই না।

–পি. কে. ব্যানার্জী

(লীগে মোহনবাগান মহামেডান স্পোর্টিংকে হারাবার পর।)

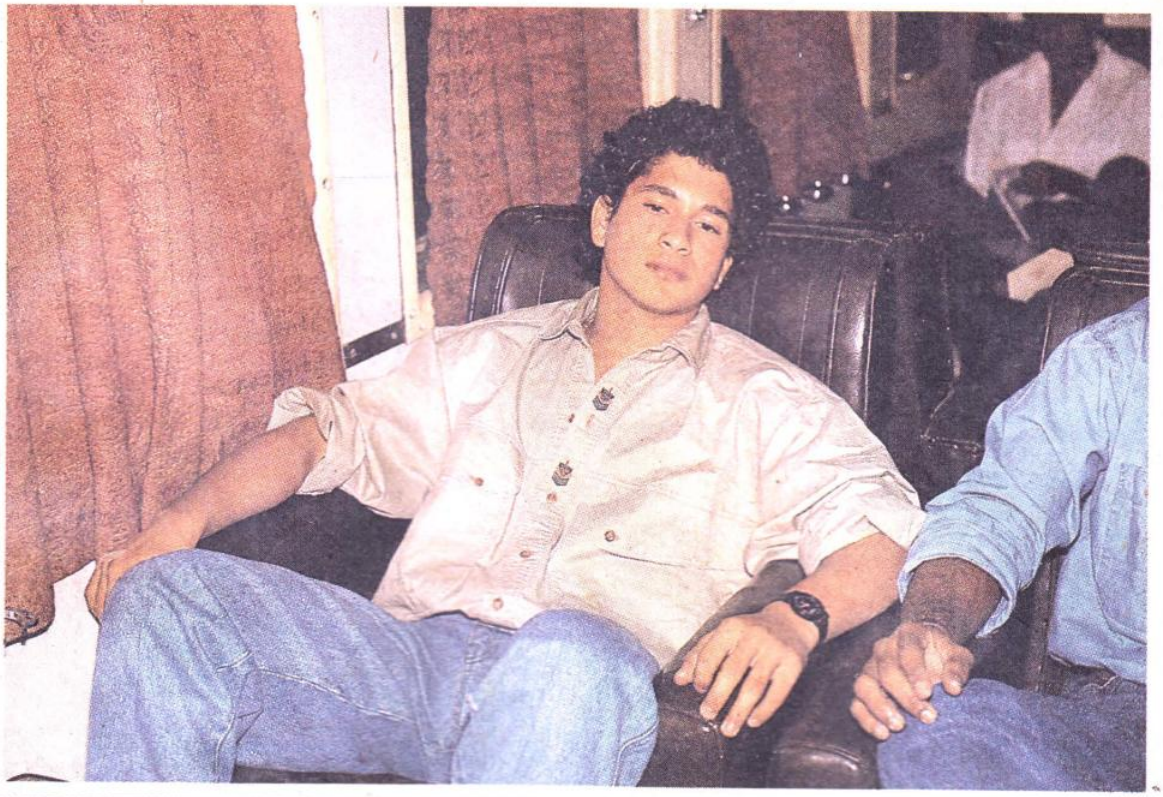

মাত্র ৩০ দিনের জন্যে

মাত্র তিরিশ দিনের জন্যে সবথেকে কম বয়সে টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরি করার বিশ্ব রেকর্ড গড়তে পারলো না ভারতের তরুণ ব্যাটসম্যান শচীন তেন্ডুলকার। ভাগ্য একটু সহায়তা করলে অবশ্য রেকর্ডটা এসে যেতো ওরই মুঠোয়। এ বছর অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি শচীন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে লেপিয়ার টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষে ৮০ রানে অপরাজিত রয়ে গিয়েছিলো। সেদিন সকলেই ধরে নিয়েছিলো পরের দিন শচীন পাকিস্তানের মুস্তাক মহম্মদের সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরি করার রেকর্ডটা ভেঙে দেবে, কিন্তু শচীনের স্বপ্ন সফল হলো না। পরদিন সকালে ৮৮ রানের মাথায় সে আউট হয়ে গেলো। সেদিন তার বয়স ছিলো ১৬ বছর ২৯৩ দিন। ভারতের পরের টেস্ট ছিলো অকল্যান্ডে। সেখানেও সেঞ্চুরি পেলো না শচীন।

পেলো এই এতোদিনে। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে শচীন তার জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিটি পেলো। করলো দর্শনীয় ১১৯ রান। কিন্তু মুস্তাককে ততোদিনে সে বয়সের দিক দিয়ে ডিঙিয়ে গেছে। মুস্তাক মহম্মদ প্রথম সেঞ্চুরি করেছিলেন ১৭ বছর ৮২ দিনের মাথায়। শচীন যখন সেঞ্চুরি পেলো তখন তার বয়স আরও ৩০ দিন বেড়ে গেছে। ওল্ড ট্রাফোর্ডে সেঞ্চুরি করার দিন শচীন তেন্ডুলকারের বয়েস ছিলো ১৭ বছর ১১২ দিন। তবে বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে মুস্তাক মহম্মদ আর শচীন তেন্ডুলকার ছাড়া আর কেউই ১৭ বছর বয়সে সেঞ্চুরি করতে পারেননি।

বিশ্ব রেকর্ড করতে না পারলেও ভারতীয়দের মধ্যে সেই এখন টেস্ট খেলায় সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরি করার রেকর্ডের অধিকারী। শচীন ভেঙে দিলো কপিলদেবের রেকর্ড। কপিলদেব টেস্ট খেলায় প্রথম সেঞ্চুরি করেছিলেন ২০ বছর ২১ দিনের মাথায়।

এপর্যন্ত বিশ্ব ক্রিকেটে মাত্র ২৬ জন ব্যাটসম্যান ২১ বছরে পা দেবার আগেই সেঞ্চুরি করেছেন। এই ২৬ জনের মধ্যে ৬ জন করে মোট ১৮ জনই পাকিস্তান, ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান।

সবচেয়ে কম বয়সে ডবল ও ট্রিপল সেঞ্চুরি করার বিশ্ব রেকর্ড করেছেন পাকিস্তানের জাভেদ মিঁয়াদাদ আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের গ্যারফিল্ড সোবার্স। জাভেদ ১৯ বছর ১৪১ দিনের মাথায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে করাচিতে ২০৬ রান করেছিলেন। সোবার্স ২১ বছর ২১৬ দিনের দিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিংস্টনে ৩৩৫ (অপরাজিত) রান করে টেস্ট ক্রিকেটে সবথেকে কম বয়সে ট্রিপল সেঞ্চুরি আর টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নজির গড়েছিলেন।

নিচে সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরি করা খেলোয়াড়দের তালিকা দেওয়া হলো ঃ

পাকিস্তান (৬ জন খেলোয়াড়,৯টি সেঞ্চুরি)

বয়স	নাম	রান	বিরুদ্ধে	কোথায়	সাল
১৭ বছর ৮২ দিন	মুস্তাক মহম্মদ	১০১	ভারত	দিল্লি	১৯৬০-৬১
১৭ বছর ২৫১ দিন	মুস্তাক	১০০*	ইংলন্ড	নটিংহ্যাম	১৯৬২
১৮ বছর ৩২৮ দিন	সেলিম মালিক	১০০*	শ্রীলংকা	করাচি	১৯৮১-৮২
১৯ বছর ২৬ দিন	মহঃ ইলিয়াস	১২৬	নিউজিল্যান্ড	করাচি	১৯৬৪-৬৫
১৯ বছর ১১৯ দিন	মিঁয়াদাদ	১৬৩	নিউজিল্যান্ড	লাহোর	১৯৭৬-৭৭
১৯ বছর ১৪১ দিন	মিঁয়াদাদ	২০৬	নিউজিল্যান্ড	করাচি	১৯৭৬-৭৭
১৯ বছর ২৬৪ দিন	সেলিম মালিক	১০৭	ভারত	ফয়সালাবাদ	১৯৮২-৮৩
২০ বছর ৫৮ দিন	হানিফ মহম্মদ	১৪২	ভারত	ভাওয়ালপুর	১৯৫৪-৫৫
২০ বছর ১৫৪ দিন	সৈয়দ আমেদ	১৫০	ওঃ ইন্ডিজ	জর্জ টাউন	১৯৫৭-৫৮

ভারত–(৬ জন খেলোয়াড়, ৬টি সেঞ্চুরি)

১৭ বছর ১১২ দিন	শচীন তেন্ডুলকার	১১৯*	ইংলন্ড	ওল্ড ট্রাফোর্ড	১৯৯০
২০ বছর ২১ দিন	কপিলদেব	১২৬*	ওঃ ইন্ডিজ	দিল্লি	১৯৭৮-৭৯
২০ বছর ১৩১ দিন	আব্বাস আলি বেগ	১১২	ইংলন্ড	ওল্ড ট্রাফোর্ড	১৯৫৯
২০ বছর ২৪৯ দিন	রবি শাস্ত্রী	১২৮	পাকিস্তান	করাচি	১৯৮২-৮৩
২০ বছর ২৫৩ দিন	বিজয় মঞ্জরেকার	১৩৩	ইংলন্ড	লিডস	১৯৫২
২০ বছর ২৮১ দিন	গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	১৩৭	অস্ট্রেলিয়া	কানপুর	১৯৬৯-৭০

অস্ট্রেলিয়া (৬ জন খেলোয়াড়, ৭টি সেঞ্চুরি)

১৯ বছর ১২১ দিন	নিল হার্ভে	১৫৩	ভারত	মেলবোর্ন	১৯৪৭-৪৮
১৯ বছর ১৫২ দিন	এ জ্যাকসন	১৬৪	ইংলন্ড	এডিলেড	১৯২৮-২৯
১৯ বছর ২৯৪ দিন	নিল হার্ভে	১১২	ইংলন্ড	লিডস	১৯৪৮
১৯ বছর ৩৫৭ দিন	ডগ ওয়াল্টার্স	১৫৫	ইংলন্ড	ব্রিসবেন	১৯৫৬-৫৭
২০ বছর ১২৯ দিন	ডন ব্রাডম্যান	১১২	ইংলন্ড	মেলবোর্ন	১৯২৮-২৯
২০ বছর ২৪০ দিন	জে বার্ক	১০১*	ইংলন্ড	এডিলেড	১৯৫০-৫১
২০ বছর ৩১৭ দিন	সি হিল	১৮৮	ইংলন্ড	মেলবোর্ন	১৮৯৭-৯৮

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২ জন খেলোয়াড়, ৫টি সেঞ্চুরি)

২০ বছর ২৩০ দিন	জর্জ হেডলি	১৭৬	ইংলন্ড	ব্রিজটাউন	১৯২৯-৩০
২০ বছর ২৬৭ দিন	ঐ	১১৪	ইংলন্ড	জর্জটাউন	১৯২৯-৩০
২০ বছর ২৭০ দিন	ঐ	১১২	ইংলন্ড	জর্জটাউন	১৯২৯-৩০
২০ বছর ৩১৫ দিন	ঐ	২২৩	ইংলন্ড	কিংসটন	১৯২৯-৩০
২০ বছর ৩৩০ দিন	কোলি স্মিথ	১০৪	অস্ট্রেলিয়া	কিংসটন	১৯৫৪-৫৫

ইংলন্ড (২ জন খেলোয়াড়, ২টি সেঞ্চুরি)

২০ বছর ১৯ দিন	ডেনিস কম্পটন	১০২	অস্ট্রেলিয়া	নটিংহাম	১৯৩৮
২০ বছর ৩২৪ দিন	জে হিয়ার্নি	১১৪	অস্ট্রেলিয়া	মেলবোর্ন	১৯১১-১২

দক্ষিণ আফ্রিকা (২ জন খেলোয়াড়, ৩টি সেঞ্চুরি)

১৯ বছর ৩১৮ দিন	গ্রেমি পোলক	১২২	অস্ট্রেলিয়া	সিডনি	১৯৬৩-৬৪
১৯ বছর ৩৩২ দিন	ঐ	১৭৫	অস্ট্রেলিয়া	এডিলেড	১৯৬৩-৬৪
২০ বছর ১৪৮ দিন	ওয়েন স্মিথ	১২৯	ইংলন্ড	লিডস	১৯২৯

নিউজিল্যান্ড (১ জন খেলোয়াড়, ১টি সেঞ্চুরি)

১৯ বছর ১২১ দিন	এইচ ভিভিয়ান	১০০	দঃ আফ্রিকা	ওয়েলিংটন	১৯৩১-৩২

শ্রীলংকা (একজন খেলোয়াড়, ১টি সেঞ্চুরি)

২০ বছর ১ দিন	অরবিন্দ ডি সিলভা	১২২	পাকিস্তান	ফয়সালাবাদ	১৯৮৫-৮৬

* অপরাজিত

খবর টবর

গুডবাই

ইংলণ্ডের ফুটবলের গ্রেট সোলজার বলে পরিচিত, সবার প্রিয় ডিফেণ্ডার টেরি বুচার অবসর নিচ্ছেন। গত দশ বছর ধরে তিনি শিরোনামে আছেন। ইংলণ্ড দলের পক্ষে গত আট বছর তিনি পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হিসেবে খেলে গেছেন। এখনও তিনি ফর্মের শীর্ষে। তাহলে সরে যাচ্ছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বুচার বলেছেন, আরে আমার বয়সটা তো বাড়ছে। আমার জায়গাটা কোনো তরুণ খেলোয়াড়কে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাছাড়া আমি কি আর আগের টেরি বুচার আছি?

গ্লাসগো রেঞ্জার্সের সেণ্টার ব্যাক টেরি বুচারের বয়স কিন্তু এখন মাত্র ৩১। তিনি বলেছেন, ফুটবল মাঠকে গুডবাই জানাবার এই তো সেরা সময়। থামতে তো একদিন হবেই। শিরোনামে থাকতে থাকতে সরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

মারাদোনা-মারাদোনা

মারাদোনা সব সময়ই সংবাদের শিরোনামে। বিশ্বকাপের পর নেপেলসে পৌছেই আবার জড়িয়ে পড়েছেন বিতর্কে। আসলে দেরি হয়ে গিয়েছিলো বলে একটু বেশি জোরেই চালিয়েছিলেন গাড়ি। নেপোলির প্র্যাকটিস শুরু হয়ে যাচ্ছে। দেরি করে পৌছাতে চান না বলেই মারাদোনা ভীষণ জোরে গাড়ি চালিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ধরলো তাঁকে। ফাইন দিয়ে তবেই নিস্তার পেলেন। গেলেন প্র্যাকটিশে। ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ায়–সেই দেরিই কিন্তু হয়ে গেলো।

পরের ঘটনা নাচের আসরে যাওয়া। নাচের আসর বসেছে শুনে নেপোলির খেলোয়াড়রা ছুটলেন। দলে পড়ে মারাদোনাও ভিড়লেন সেখানে। ব্যাস আর যাবে কোথায়! বিনা অনুমতিতে নাচের আসরে যাওয়া–সারারাত ধরে নাচা–সুতরাং খেলোয়াড়দের ফাইন করলেন নেপোলি কর্তৃপক্ষ। মারাদোনাকেও দিতে হলো সেই জরিমানা।

তারপর কি হলো?

বড় বড় প্রতিযোগিতা যখন হয় তখন সারা বিশ্বের জুয়াড়িরা বাজি ধরেন। বিশ্বকাপের ফলাফল নিয়ে কতো দর কষাকষি যে হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। খোদ কলকাতাতেও জুয়াড়িরা সক্রিয় ছিলেন। সে হলো গিয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বিশ্বকাপের দু'জন নামকরা খেলোয়াড় যে বাজি ধরে বসেছিলেন–সে খবর জানা আছে কি? এই দুই খেলোয়াড় হলেন পশ্চিম জার্মানির রুডি ভয়েলার আর ইতালির গিয়াসপি গিয়ানিনি। এঁরা দু'জনেই ইতালির রোমা ক্লাবে খেলেন। বাজির শর্তও ভারী মজার ছিল। বিশ্বকাপে ভয়েলারের দল জিতলে গিয়ানিনি মাথা কামিয়ে ন্যাড়া হয়ে যাবেন। আর ইতালি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলে ভয়েলার তাঁর দাড়ি কামিয়ে ফেলবেন। ভয়েলার তো বেঁচে গিয়েছে। গিয়ানিনি বাজির শর্ত পালন করেছেন কিনা জানা যায়নি কিন্তু!

ইস্টবেংগল দলের খেলোয়াড়রা

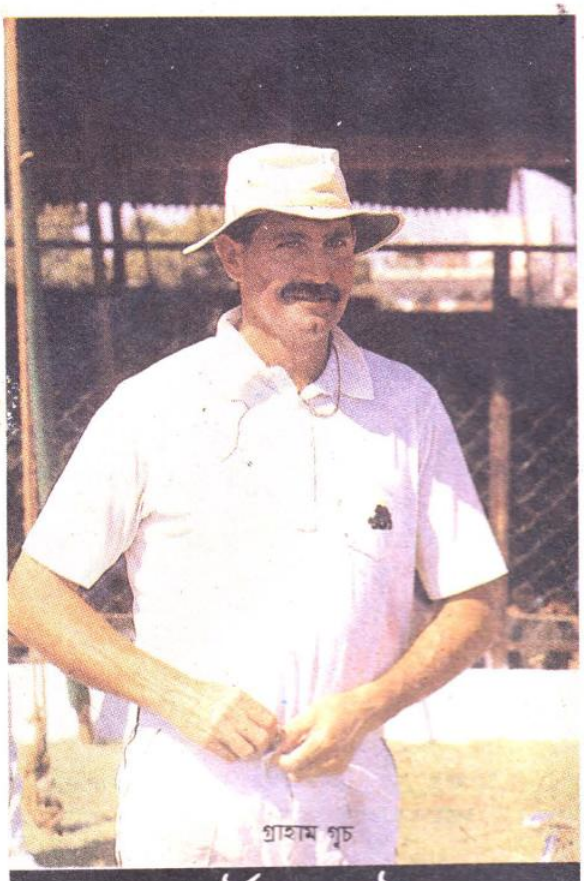

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্ন

১। এবারের বিশ্বকাপে প্রথম গোলটি কে করেছেন? কোন দলের বিরুদ্ধে?

২। টেস্ট ক্রিকেটে আজহারউদ্দিন ইংলন্ড সফর পর্যন্ত মোট দশটি সেঞ্চুরি করেছেন—এর মধ্যে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ক'টি আছে?

৩। এশিয়াড ফুটবলে ভারত খেলেনি—এমন কি কোনোবার হয়েছে?

৪। এশিয়াডের একশ, দুশ আর চারশ মিটার দৌড়ে বরাবর পি. টি. ঊষার দিকে কে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেন?

৫। এবারের খুবই নামকরা একজন খেলোয়াড় চার বছর পরে নিজের দেশের কোচ হিসেবে বিশ্বকাপের আসরে যেতে চান। তিনি কে?

৬। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নেমে কার বলে পরপর চারটি ছক্কা হাঁকিয়ে কপিলদেব বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন?

৭। শচীন তেন্ডুলকারের আগে পর্যন্ত ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সব চেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরি করার রেকর্ড কার ছিলো?

উত্তর :

১। ক্যামেরুনের ওমান বিয়িক। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে।
২। পাঁচটি।
৩। না।
৪। লিডিয়া দাভেগা।
৫। আর্জেন্টিনার দিয়েগো আরমান্ডো মারাদোনা।
৬। স্পিনার এডি হেমিংসের বলে।
৭। কপিলদেবের।

জানো কি

□ প্যাডের কাগজে একটা সংখ্যা লিখে ভাঁজ করে রাখতে দিলেন এক ভদ্রলোককে। তারপর পাঁচজনকে দিয়ে পরপর পাঁচ অঙ্কের পাঁচটা সংখ্যা লেখালেন। একজনকে দিয়ে সংখ্যাগুলো যোগ করলেন। তারপর.......

□ গভীর রাতে ভীষণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কেষ্টদা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের। বাগানবাড়িতে পিকনিক করতে এসে শেষে কি প্রাণটা যাবে! কিন্তু যার ভরসায় থাকা সেই জকি কোথায়? জকির সাড়াশব্দ নেই কেন?

□ মন্দিরের মধ্যে উঁকি দিল জো। দেখল দুটো ঝকঝকে সবুজ আলো। স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলছে আর নিভছে। মনে হচ্ছে যেন হীরের ওপর আলো ঠিকরে পড়ছে। জো হতবাক—কীসের আলো ওই দুটো?

□ বাঘের ডাক শোনা যায়, গ্রামের লোকও বাঘ দেখেছে অথচ শিকারী বলছেন জঙ্গলে বাঘ নেই। মহা চিন্তায় পড়েছেন বাঁকুড়ার এস. পি. মিঃ সমাদ্দার। কিন্তু তারপর.....?

□ ম্যাম'জেল এক্স আলপসের বরফ ভেঙে স্কি করে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। জার্মান সৈন্যদের আগে তাঁকে দুর্ঘটনায় পড়া প্লেনটার কাছে পৌঁছতেই হবে। উদ্ধার করতে হবে পাইলটকে আর গোপন কাগজপত্তরগুলো। পারবেন কি তিনি?

এইসব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। সেইসঙ্গে আরও এমন অনেক কিছু আছে যা সকলকে চমকে দেবেই।

বরানগর নেতাজী হাই স্কুল

সুমন ভট্টাচার্য

কলকাতা পৌরসভার অঞ্চল যেখানে শেষ, ঠিক সেইখানে শুরু বরাহনগর পৌরসভার। বরাহনগর পৌরসভার এলাকাটিও খুব ছোট নয়, বি. টি. রোডের দুপাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বি. টি. রোডের উপর পালপাড়া ফাঁড়ি স্টপেজে নেমে কিছুদূর এগোলেই উদ্বাস্তুদের বাসস্থানের মাঝে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বরাহনগর নেতাজী হাইস্কুল। মাধ্যমিক এই বিদ্যালয় কলকাতা শহরতলির খুব নিকটে হলেও আমাদের কাছে ততো পরিচিত নয়।

উদ্বাস্তু কলোনীর মধ্যবর্তী এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। ১৯৫০ সালে বাংলাদেশ থেকে চলে আসা কিছু উদ্বাস্তু এই অঞ্চলের জলাভূমি ভরাট করে নিজেদের বসতি গড়ে তোলেন, নাম দেন নেতাজীনগর। জীবনের প্রাথমিক চাহিদাগুলি মেটাবার পরে, অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করবার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রমের পরে তাঁরা নজর দেন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির দিকে। ফলে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের চেষ্টায় ও উৎসাহে প্রতিষ্ঠা করলেন নেতাজী হাইস্কুল। সকলের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে এবং সামান্য সরকারী অনুদানে যাত্রা শুরু হলো বিদ্যালয়ের। যে দেশবরেণ্য জননায়কের নামে ঐ অঞ্চলের নামকরণ, সেই নেতাজীর জন্মদিনে ১৯৫৪-র ২৩শে জানুয়ারী স্কুলের অনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। তারপরে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজ বিদ্যালয়টি এই অঞ্চলের এক পরিচিত নাম। অতীতে এই বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব ছিল স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদেরই হাতে। তারপরে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কিছুদিন প্রশাসকও নিযুক্ত হয়েছিল। বর্তমানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত পরিচালন সমিতির (ম্যানেজিং কমিটি) উপরই প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পিত। এই পরিচালন সমিতির বর্তমান সম্পাদক স্থানীয় অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রথিতযশা অ্যাডভোকেট বীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। বিদ্যালয়ের উন্নতি ও সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যস্ত মানুষ বীরেন্দ্রবাবু অনেকটা সময়ই ব্যয় করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অনেকাংশে বিদ্যালয়ের উন্নতির ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে সর্বদা সচেষ্ট একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব, বর্তমান প্রধান শিক্ষক অমলেন্দু আচার্য মহাশয়। ১৯৬৩র জুলাই মাস থেকে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন অমলেন্দুবাবু, ১৯৭৯ সালে তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৯০ সালে এই বিদ্যালয় থেকে ৩৫ জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় এবং সবাই পাশ করে। ৩ জন প্রথম ডিভিশন পায়, সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র ৭০ শতাংশ নম্বর পায়। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উৎসাহে ও নিরলস প্রচেষ্টায় অতীতেও এই বিদ্যালয় থেকে বহু ছাত্র বেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুবিমল কাঞ্জিলাল, তরুণ আইচ, জগবন্ধু দাস, সুভাষ নাগ প্রমুখ। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সন্নিহিত নেতাজী কলোনীর মাঠেই খেলাধূলা করে। ছাত্রদের মধ্যে ক্রিকেট, ফুটবল ও ভলিবল খেলার প্রতিই আগ্রহ বেশি। অনেক কিশোর ছাত্রই রাজ্যস্তরের বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে ও করে। অনেকেই আবার সুরজিৎ সেনগুপ্ত কিংবা চুণী গোস্বামীর ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরে তালিম নেয়। এ বিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্র ভালো খেলার সুবাদে টাটায় চাকরি পেয়েছে। অতীতে এই বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সমীর বিশ্বাস, সত্যব্রত মজুমদার, তিনকড়ি দে প্রমুখ। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের দুজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ছাত্র হলো সুব্রত সরকার, কালীচরণ কর্মকার। এই বিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নওলকিশোর প্রসাদ সিনহা। খেলাধূলার বাইরে গান, আবৃত্তি, বিতর্ক ও নাটকে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উৎসাহ আছে। বিশেষ করে নাটকের বিষয়ে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের খ্যাতি ও উৎসাহ যথেষ্ট। এই বিদ্যালয়ের ভালো নাট্যাভিনয়ীদের মধ্যে আছে অভিজিৎ চক্রবর্তী, তাপস চক্রবর্তী, সঞ্জয় নন্দী। শিক্ষকদের মধ্যেও এই নাটকের ব্যাপারে উৎসাহ আছে। শিক্ষক শৈবাল চট্টোপাধ্যায় নাট্যকার হিসাবে খ্যাত এবং ভারতের প্রতিনিধিরূপে ফ্রান্স সফর করেছেন। অপর শিক্ষক সুভাষ চট্টোপাধ্যায় নাটকের ব্যাপারে উৎসাহী ও বিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের দেখাশোনা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক দুর্গাদাস পান্ডা বিদ্যালয়ের সংস্কৃতির বিষয়টি দেখেন ও ভীষণ উৎসাহী। দুর্গাদাসবাবুর কাছ থেকে জানতে পারলাম ছাত্র সুশান্ত দত্ত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে। এ ছাড়াও ছাত্রদের মধ্যে সঙ্গীতের জন্য দুলাল সর্দার, জয়দেব সাপুই-এর এবং আবৃত্তির জন্য বিশ্বজিৎ সাহা, অমিয় চৌধুরী প্রমুখের খ্যাতি আছে। বিদ্যালয়ের আরেকজন বিদ্যোৎসাহী ও সাংস্কৃতিবান শিক্ষক হলেন কনক রায়চৌধুরী।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় অমলেন্দু আচার্য জানালেন, "বহু প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে আজ বিদ্যালয় ছাত্র ও শিক্ষকদের মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সার্থক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানরূপে এগিয়ে চলেছে।" পড়ার সঙ্গে খেলাকেও এই বিদ্যালয় সমান গুরুত্ব দেয়। ছাত্ররা যাতে খেলাধূলায় উন্নতি করতে পারে সেদিকেও শিক্ষকরা কড়া নজর রাখেন।

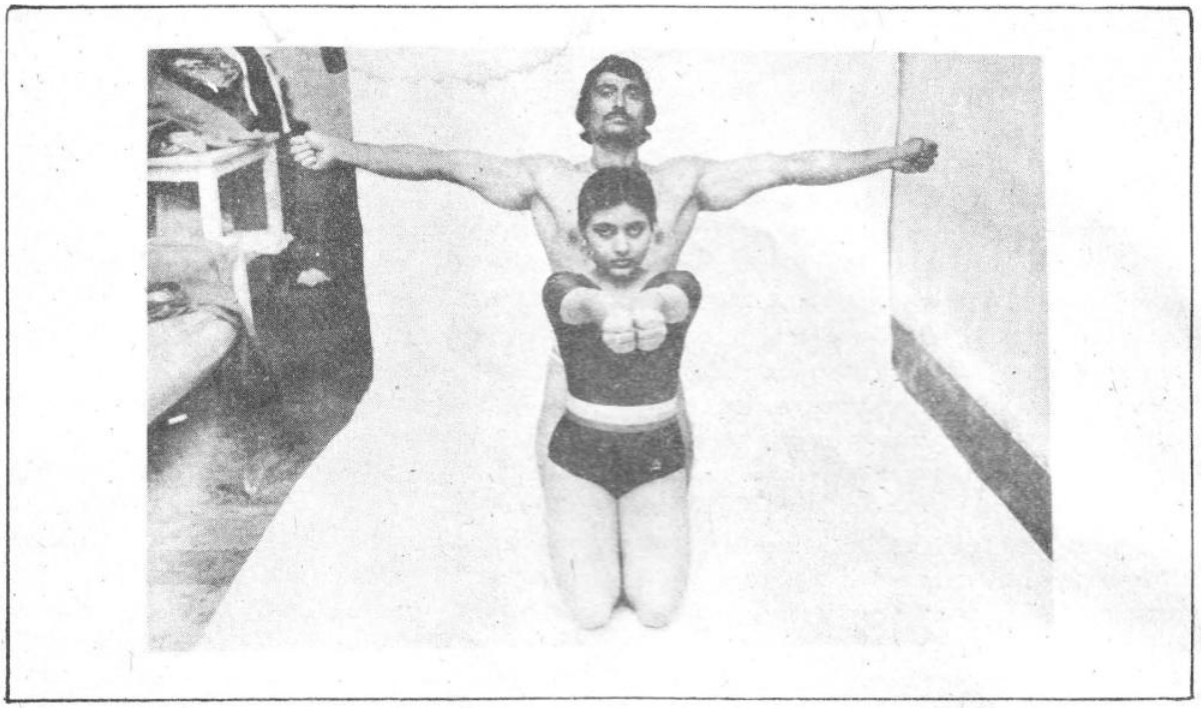

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

আমরা সবাই সুন্দরের পূজারী। বাগানের সুন্দর ফুল সকলেরই ভালো লাগে এবং পেতেও ইচ্ছা করে মনের অজান্তে। তেমনি সুন্দর শরীরও সকলের প্রত্যাশিত। কিন্তু–হ্যাঁ, সুন্দর ফুলের পিছনে যেমন আছে পরিশ্রম, আছে যত্ন, সুন্দর শরীরেরও গোপন রহস্য ঠিকমত পরিচর্চা। যদিও জানি ফুলের পিছনে থাকে অপরের শ্রম, কিন্তু শরীরের পিছনে থাকবে নিজের শ্রম। এই শ্রমটা হলো ব্যায়াম আর খেলাধূলা জাতীয় শরীরচর্চা। আর খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে একটু সংযমী আমাদের হতেই হবে। একটু চেষ্টা করলে আমরা সকলেই এগুলো করতে পারি।

তোমরা ফুলের মতো সুন্দর, আরো সুন্দর করার চেষ্টা কর নিজেদের। মনের কুঁড়েমিটুকু ঝেড়ে ফেলে আরম্ভ করে দেওয়া যেতে পারে শরীরচর্চা। আপাতদৃষ্টিতে এই চর্চা কিন্তু খুবই নীরস। কিন্তু একটি নারকেলের শক্ত খোলাটা ভাঙতে পারলে যেমন বেরিয়ে আসবে সুমিষ্ট জল আর অতি সুমিষ্ট শাঁস, ঠিক তেমনি শরীরচর্চার আপাত নীরস বাধাটা অভ্যাসের দ্বারা কাটাতে পারলে এত আনন্দ পাবে যে মুখে বলা যাবে না। মনটাও থাকবে সবসময় ফূর্তিতে ভরা। অহেতুক অপরের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটিও করতে ইচ্ছা করবে না। শরীর হয়ে উঠবে আরো লালিত্য ও ছন্দময়। যা দেখে তোমার বন্ধুরাও অনুপ্রাণিত হবে। ছোটখাটো ব্যাধিকেও আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারব। আর কঠিন ব্যাধির হাত থেকেও রক্ষা পাবো।

তাই বলি কি লেখাপড়া বা সময় না পাওয়ার অজুহাত না দিয়ে যদি প্রত্যহ নিয়মিত ২০।৩০ মিনিট সময় বের করে ব্যায়াম বা ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব বা সনাতন জিনিস যোগব্যায়াম করা যায় তাহলে আমাদের শরীর মন দুই-ই ভালো থাকবে। দেশবিদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিল্পপতি, খেলোয়াড় এক কথায় সকল শ্রেণীর মানুষই নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। তোমরাও ভবিষ্যতে বড় হয়ে আমাদের সমাজকে আরো আলোকিত করবে। তাই এখন থেকে অভ্যাস গড়ে তোল শরীরচর্চার। এই অভ্যাসের ফলে যারা অতিরিক্ত রোগা তাদের শরীরটা সুন্দর হয়ে উঠবে। আর যারা মোটা তারাও সুন্দর হবে।

যাদের বাড়ির কাছে ব্যায়ামাগার বা শরীরচর্চা করার কোনো স্থান নেই আর স্থান থাকলেও ব্যায়ামাগারে নিয়মিত যাবার সময় নেই, তারা নিজেদের ঘরেই শরীরচর্চা করতে পারো।

তবে কয়েকটা বিষয়ে একটু খেয়াল রাখতে হবে। (১) ঘরের জানালা দরজা খোলা রাখতে হবে। (২) ব্যায়াম করার সময় মাটিতে কম্বল, সতরঞ্চি বা এ ধরনের নরম কিছু পেতে নিতে হবে। (৩) বিশেষ কিছু খাবারও খেতে হচ্ছে না। বাড়িতে যেসব জিনিস রান্না হয় তা খেলেই চলবে। তবে অতিরিক্ত ভাজা, মসলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য অতি অবশ্যই বর্জন করতে হবে। (৪) সকাল বা বিকাল বেলায় আসন করতে পারলে ভালো হয়। তবে এই সময় আসন করার সুযোগ না থাকলে অন্য যে কোনো সময় করা যেতে পারে। তবে আমি বলি কি স্কুল থেকে ফিরে মুখ হাত পা ধুয়ে অল্প কিছু খেয়ে তার ২০।৩০ মিনিট পর ব্যায়াম করলে ভালো হয়। আর যারা স্কুল থেকে ফিরে একটু বেশি খাও তারা এক ঘন্টা পরে আরম্ভ করবে। (৫) পাতলা ঢিলেঢালা পোশাক পরে করবে। মেয়েরা শালোয়ার কামিজ পরে করবে। কিন্তু ছেলেরা যারা লেঙট বা কৌপিন পরতে পারো তারা এটা ব্যবহার করবে। অন্যথায় আজকাল ভালো নাইলন জাঙিগয়া বের হয়েছে। অনুশীলনের সময় তাও ব্যবহার করতে পারো। (৬) ব্যায়ামের পূর্বে অতি অবশ্যই প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে রাখবে। (৭) ব্যায়ামের সময় কথা না বলা ভালো। এই সময় শরীরের উন্নতির কথা চিন্তা করবে। এতে মনের একাগ্রতা বাড়বে। তাড়াহুড়ো করে বা খুব জোর দিয়ে কোনো ব্যায়াম করতে যাবে না। এতে চোট লেগে যাবার ভয় থাকে বা অন্যকোনো উপসর্গও আসতে পারে।প্রথম প্রথম কঠিন ব্যায়াম না করতে যাওয়াই উচিত। (৮) ব্যায়াম করার সময় খুব জলপিপাসা পেলে জল বেশি খাবে না। জল খাওয়ার পূর্বে মুখে জলটা একটু রেখো, পরে আস্তে আস্তে ঢোক গিলে অল্প অল্প খাবে।

বজ্রাসনে Chest Contraction বা বুকের পেশী সংকোচন প্রসারণঃ

এই আসন আর তার সংগে ব্যায়ামটা দিয়ে লেখা আরম্ভ করলাম কারণ শরীরচর্চা করার প্রথম নিয়মই হচ্ছে শরীরটাকে একটু গরম করে নেওয়া অর্থাৎ ব্যায়াম করার উপযোগী করে নিতে হয়।

বজ্রাসনে অর্থাৎ হাঁটু মুড়ে দু'পায়ের পাতার উপর-পিঠ মাটিতে পেতে গোড়ালী ফাঁক করে তার উপর নিতম্ব রাখতে হবে, শিরদাঁড়া সোজা ও হাঁটুদ্বয় জোড়া অবস্থায় থাকবে। যাদের পায়ের পাতা মাটিতে পেতে বসতে অসুবিধা হবে তারা তাদের পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে গোড়ালীর উপর নিতম্ব রেখে বসবে। ছবির সামনের জনের ন্যায় হাত মুঠি ও প্রসারিত করে সামনের দিকে কাঁধ বরাবর তুলে রাখ অর্থাৎ হাতদুটি এখন মাটির সমান্তরাল থাকবে। এখন শ্বাস টানতে টানতে মাটির সমান্তরাল হাত রেখে পাশের দিকে নিয়ে যাও পিছন জনের ন্যায় এবং সংগে সংগে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাতদুটিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে পূর্বের অবস্থায় বা সামনের জনের ন্যায়। এই ভাবে পরপর আট-দশবার করে পাদুটিকে সামনে ছড়িয়ে বস আট-দশ সেকেন্ড স্বাভাবিক অবস্থায়। এটি একক্ষেপ হলো। এইভাবে দুই-তিন ক্ষেপ অভ্যাস কর। প্রথমেই বলেছি এই ব্যায়ামে শরীরের কিছু পেশী ব্যায়াম করার উপযোগী হয়ে ওঠে। কাঁধ, বুক, পিঠ, ডেলটয়েড প্রভৃতি পেশীগুলিরও ব্যায়াম হয়, শ্বাসকার্যে সাহায্যকারী পেশীগুলিরও উপযুক্ত ব্যায়াম হয়। ফুসফুসের বাড়াকমা হওয়ার জন্যে যারা শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানিতে ভুগছে তারাও আরাম পাবে বিশেষ করে ফুসফুসের বায়ুধারকত্ব বৃদ্ধি পাবে। যারা প্রায়ই সর্দি কাশিতে ভোগো এই ব্যায়ামটি নিয়মিত নিশ্চয়ই করবে। যাদের রাত্রের দিকে পা কামড়ায় অর্থাৎ পা ব্যথা করে, বিশেষ করে অতিরিক্ত খেলাধূলা করার জন্য বা যারা পায়ের বাতে ভুগছে এই বজ্রাসন ভংগিতে বসার জন্য আরাম পাবে। হজমশক্তি বৃদ্ধি পাবে ক্রমান্বয়ে। নির্দিষ্ট ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া আর ছাড়ার জন্য এটি একটি আধুনিক প্রাণায়ামও হলো।

শরীর গড়ো এই পর্যায়ে আরো ব্যায়াম আমরা শেখাবো নিয়মিত। তোমরা অবশ্যই অভ্যাস করবে। কারো কোনও কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাদের দপ্তরে চিঠি দিও।

ছবি : লেখক

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

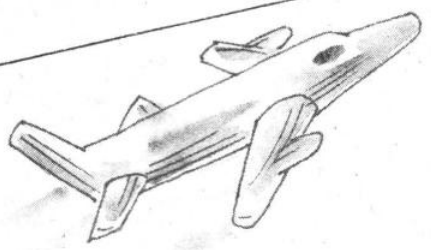

শব্দের চেয়ে দ্রুতগতি যান

আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন যান চালু হয়ে যাবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং নাসা (NASA)-র বিজ্ঞানীরা এ রকম একটি যানের মডেল তৈরি করেছেন। যানটির নাম X-30। বিজ্ঞানীরা বলেছেন এই যানে ওয়াশিংটন থেকে টোকিও যেতে সময় লাগবে মাত্র দু'ঘন্টা। বর্তমানে লাগে চোদ্দ ঘন্টা।

হ্যালির চেয়ে উজ্জ্বল

কয়েক বছর আগে হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীর কক্ষপথে আশি বছর পর এসেছিল। তখন হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। কারণ এযাবৎকাল ধারণা ছিল হ্যালিই সবচেয়ে বড় আর উজ্জ্বল ধূমকেতু। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। গত বছর নিউজিল্যান্ডের একটি মানমন্দির থেকে হ্যালির ধূমকেতুর চাইতে দশ গুণ বড় একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করেন জ্যোতির্বিদ রডনি অস্টিন। বর্তমানে সান্টিয়াগোর উত্তরে চারশ সাতাশ কিমি দূরের চিলির মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অস্টিনের আবিষ্কার সমর্থন করেছেন। তাঁরা ধূমকেতুর ছবিও তুলেছেন। ধূমকেতুটির নাম দেওয়া হয়েছে অস্টিন ১৯৮৯।

পুরস্কার

সম্প্রতি '৮৯ সালের জন্য ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস আটজন তরুণ বিজ্ঞানীকে পুরস্কৃত করেছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গবেষণায় কৃতিত্বের জন্য ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস প্রদত্ত হীরালাল চক্রবর্তী পুরস্কার পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুমিতা ঝা এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মহম্মদ মুশাফর আলম। পদার্থবিদ্যার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমারী কে কে রোহ্‌টাগি। পুরস্কারটির নাম সি ভি রমন পুরস্কার।

ছবি ঃ সুফি

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে ?

তা পুজো কেমন কাটলো ? খুব মজা হয়েছে না ! তা তো হবেই ! পুজো বলে কথা ! যাই বলো, পুজো আসছে আসছে এইটাই ভালো–এসে গেলে বড় তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যায়। তখন কী খারাপই যে লাগে ! শূন্য মন্ডপ। ঠাকুর নেই। অথচ জামাপ্যান্টে এখনও নতুন নতুন গন্ধ। পুজো সংখ্যাও পড়ে শেষ করে ফেলা যায়নি–এই যা রক্ষে। তা কেমন লাগলো শুকতারার শারদীয়া সংখ্যা ? কার লেখা কেমন লাগলো–সব জানাবে কিন্তু। নতুন যদি কিছু চাও তাও জানাবে।

দুর্গাপুজো শেষ। এবার আসছে কালীপুজো। কান পাতলে দিব্যি শোনা যাচ্ছে বাজির শব্দ। কালীপুজো এলেই আমার মনে পড়ে তুবড়ি তৈরির কথা। ছোটবেলায় আমরা কি উৎসাহেই না তুবড়ি তৈরি করতাম। সন্ধেবেলায় তুবড়ি প্রতিযোগিতার আসর বসতো। অনেকক্ষণ ধরে চলতো তুবড়ির সেই লড়াই। ভীষণ ভিড় হতো সেখানে। মস্ত উঁচু একটা বাঁশ পোঁতা থাকতো। তার গায় বড় বড় করে ফুটের হিসেব লেখা। কার তুবড়ি কতো উঁচুতে উঠছে, ফুট-ইঞ্চির হিসেব করা হতো ঐ মাপ দেখে। তারপর পুরস্কার দেওয়া হতো। সবশেষে বসতো বাজি পোড়ানোর আসর। বাজির শব্দে আর আলোর ঝলকানিতে চারদিকটা তখন গমগম করতো। সে যে কি মজা তা লিখে বোঝানো যায় না। এখনও অনেক জায়গায় তুবড়ির লড়াই হয়। তোমাদের কেউ কেউ হয়তো সেই প্রতিযোগিতায় নেমেছো, কেউ হয়তো শুধু দেখেছো–বলো খুব মজার ব্যাপার না ? তার ওপর যদি নিজের হাতে তৈরি তুবড়ি প্রাইজ পায় তাহলে তো আর কথাই নেই।

কিন্তু আজকাল আর আগের মতো তুবড়ি প্রতিযোগিতা হয় না। আসলে সব কিছু বদলে যাচ্ছে। তাই যায়। এই ধরো না ক'বছর আগেও রেডিও, ট্রানজিস্টারের কি বোলবোলাওই না ছিলো। খেলার রিলে শোনার জন্যে আমরা হাঁ করে বসে থাকতাম। কিন্তু মাত্র ক'বছরের মধ্যে সবকিছু কিরকম বদলে গেলো। এখন শুধু শোনা নয় তার সঙ্গে চাই দেখাও। টিভি এসে সব কিছু ওলোটপালোট করে দিয়েছে। এখন আর রেডিওতে রিলে শুনে আমরা আনন্দ পাই না। মন ভরে না। আমরা চাই দেখতে। অথচ ক'বছর আগে আমরা কি ভাবতে পারতাম ঘরে বসে একই সময়ে ইতালির এক শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের খেলা দেখতে পাবো ? অথচ সেইটাই তো আজ বাস্তব সত্য।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে এই সত্যকেও মেনে নিতে হবে। পারলে কোনো চিন্তা নেই, না পারলেই মুশকিল। তোমরা হয়তো ভাবছো, দাদুমণির হলোটা কি ? কি সব আজেবাজে কথা বলছে। কিন্তু তোমরা যদি একটু ভালো করে ভেবে দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে দাদুমণি ঠিক কি কথা বলতে চাইছে।

ওসব কথা থাক। কালীপুজো এসে গেলো, ভাইফোঁটা আসছে। তোমাদের তো এখন সুখের শরৎকাল। এই ফাঁকে একবার বাগানের দিকে তাকাও দেখি। কার বাগানে কি ফুল ফুটছে ? স্থলপদ্ম, শিউলি তো আছেই–এবার তৈরি হও শীতের ফুলের জন্যে। গাঁদা ফুলের গাছ নিশ্চয়ই লাগিয়েছো। শীতকালে নানারকম মরশুমী ফুলও ফোটে। তাও লাগাতে পারো। দেখবে বাগান একেবারে আলো করে ফুল ফুটে থাকবে। বাগানে বা টবে নিজের হাতে পোঁতা গাছে ফুল ফুটলে কেমন আনন্দ হয় বলো দেখি। কেন এই আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে ?

যাই হোক, এবারের চিঠির শুরুতে যে কথা বলেছি আবার তাই বলি–শুকতারার পুজো সংখ্যা তোমাদের কেমন লেগেছে, কার লেখাই বা কেমন লাগলো, আরও নতুন কি চাও–সব জানিয়ে আমায় নিশ্চয়ই চিঠি দিও। তোমাদের মতামত পেলে আমাদের কাজের যে খুব সুবিধে হয়।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই।

ভালো থেকো সকলে।

অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয়হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি।

তোমাদের পাতা

আমার প্রিয় বন্ধু

প্রায় তিন বছর আগের কথা। আমরা তখন ঝাড়গ্রামে থাকতাম। ওখানে একটা স্কুলে পড়তে যেতাম। সেই স্কুলে আমার অনেক বন্ধু ছিল, তাদের মধ্যে আমার প্রিয় বন্ধু ছিল অজয়। অজয়কে অন্ধ বললেই চলত, কারণ সে ভালোভাবে দেখতে পেত না। সে স্কুলে আমার কাছে বসত। আমি পড়াশোনায় ওকে সাহায্য করতাম। আমাদের বন্ধুত্ব দেখে অনেকের হিংসা হতো। তাই আমাদের বন্ধুত্ব ওরা নষ্ট করবার চেষ্টা করত। কিন্তু সব চেষ্টাই তাদের ব্যর্থ হতো।

একবার অমর বলে একটা ছেলের মামা তাকে একটা গল্পের বই দিয়েছিল। অজয় সেটা অমরের কাছ থেকে চাইতে অমর বলল, 'তুই চোখে কিছু দেখতে পাস না আবার পড়বি কি করে!'

আমি তখন অজয়ের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। এই কথা শুনে আমি অমরকে বললাম, 'তুই বড় হিংসুটে। ও কি তোর বইটাকে ছিঁড়ে দিত?' এই কথা বলে অজয়কে ডেকে নিয়ে আমি চলে এলাম। দেখলাম ওর দু'চোখে জল। আমি বললাম, 'তুই কাঁদছিস কেন? আমি আমার জমানো টাকা দিয়ে তোকে একটা বই কিনে দেব।'

অজয় বলল, 'তুই আমার জন্য এত করিস, আমি তোর জন্য কিছু করতে পারি না। কি করব বল ভাই আমরা তো খুব গরীব।' এই বলে ও চলে গেল।

পরের দিন আমি ওকে একটা বই কিনে দিলাম। ও সেই বইটা নিল এবং খুব খুশি হলো। আমিও খুশি হয়ে বাড়িতে ফিরলাম। বাড়িতে গিয়ে বাবার বদলি হবার কথা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। পরের দিন আমরা চলে যাব কলকাতায় এ কথা আমি কিছুতেই অজয়কে বলতে পারলাম না।

আমরা চলে আসার কিছুদিন পরে ঝাড়গ্রাম থেকে একটা চিঠি এল। সেই চিঠিতে লেখা অজয়ের মৃত্যুর খবর। আমি চলে আসার পর অজয় অমরের সঙ্গে বাড়ি ফিরত। একদিন ওদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হতে অজয় একা একা বাড়ি ফিরছিল। পথে একটা খাল পড়ে। খালটা খুব গভীর। ওই খালটার উপরে একটা শাঁকো আছে। শাঁকোটা পার হতে গিয়ে অজয় পা হড়কে জলে পড়ে যায়। এই ঘটনাটা আমার এখনও মনে হলে দুঃখ হয়, কারণ সে আমার সত্যিই প্রিয় বন্ধু ছিল।

অভীক পাঁজা, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী
কল্যাণী সেন্ট্রাল মডেল স্কুল, কল্যাণী

দেবারতি বসাক
বয়স পাঁচ, কে জি ওয়ান, কদমতলা, হাওড়া

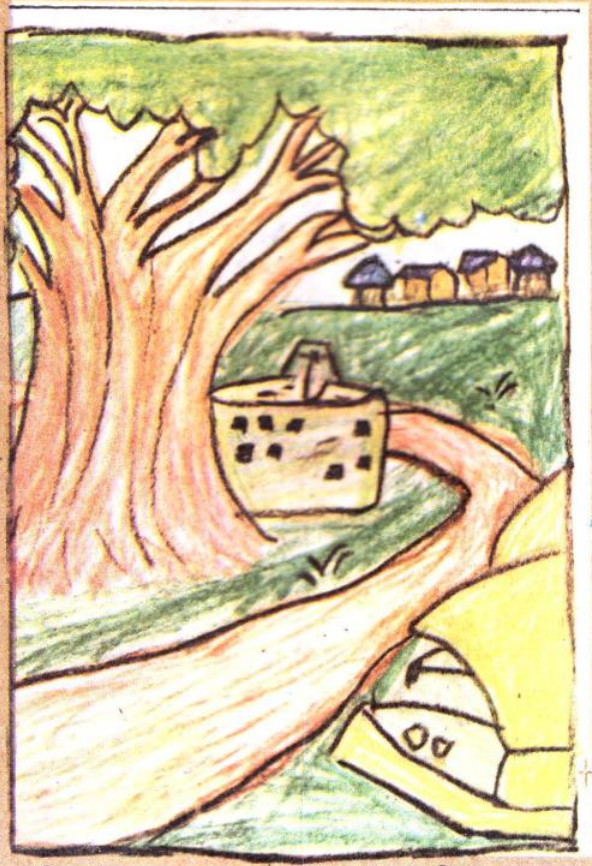

বিশ্বজিৎ দেবনাথ, বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী
রেলওয়ে মহিলা সমিতি, শিশুনিকেতন, বর্ধমান

ঘুঁষোঘুঁষি

এক ঘুঁষিতে নাক ফাটাব,
দুই ঘুঁষিতে মুখটা,
তিন ঘুঁষিতে ভাঙব জেনো,
চওড়া তোমার বুকটা।
চার ঘুঁষিতে গালের চোয়াল,
পাঁচ ঘুঁষিতে পাঁজরা,
ছয় ঘুঁষিটা মারব কোথায়?
বাকি যে সব ঝাঁঝরা।
সাত ঘুঁষিতে দিতে হবে
রণে তোমায় ভংগ,
অষ্ট ঘুঁষি ঝাড়লে, বাপু,
ছাড়বে অসৎ সংগ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী
সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
করিমগঞ্জ

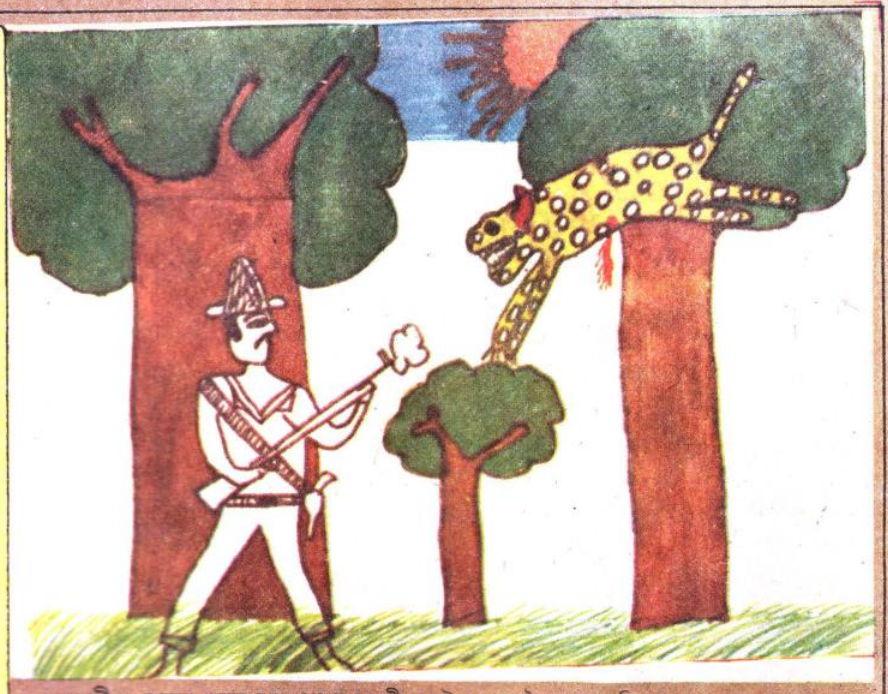

রাজদীপ সাহা, বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী, সাউথ পয়েন্ট স্কুল, কলিকাতা

শ্রাবণী ভট্টাচার্য, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, বড়িশা গার্লস হাই স্কুল, কলিকাতা

পার্থসারথি আচার্য বয়স ষোল, দশম শ্রেণী
দেশবন্ধু বিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

পিংকি গুহরায়, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী
শ্যামাপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয়, শ্রমথনগর

ছড়া

কান টানলে মাথা আসে
সংগে আসে চুল।
কষতে গিয়ে মন না দিলে
অংকে হয় ভুল।
চোখ বুজলে ঘুম আসে,
সংগে আসে স্বপ্ন।
ভূগোলেতে মন না দিলে
দিল্লী হবে লখ্‌নো।

শৌভিক চক্রবর্তী। বয়স আট, দ্বিতীয় শ্রেণী
স্কটিশ চার্চ স্কুল, কলকাতা

ভাগ্য ফেরালো বেড়াল

শ্যামাপদ কর্মকার

লন্ডন শহর থেকে অনেকদূরের এক গ্রামের বাপ-মরা ছেলে ডিক। মা ছাড়া ওর আর কেউ নেই এ পৃথিবীতে। অনেকদিন দুঃখকষ্ট করে সংসার চালিয়ে এসেছে ওর মা। এখন বয়স হয়েছে, আর পারছে না। ডিকের বয়স তের। এই তের বছরের ছেলেকেই মা বলতে বাধ্য হলো–বাবা ডিক, আমি তো আর সংসার চালাতে পারছি না। এবার তোকে উপার্জনের চেষ্টা করতে হবে।

করুণ চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকায় ডিক। সত্যি মায়ের শরীর বড় খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ও নিজে কি করে উপায় করবে? ও তো আর মায়ের মতো সেলাই-ফোড়াই শেখেনি; শেখেনি ফসল ঝাড়ার কাজ। মুরগীগুলোকে খেতে দেওয়া, ঘরে তোলার মতো সামান্য একটু-আধটু কাজ ছাড়া মা ওকে কিছুই করতে দিত না। তাই বেশ চিন্তিত মনে মাকে জিজ্ঞেস করল–আমায় কি করতে হবে, তা যদি তুমি বলে দাও মা, তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখবো।

–হ্যাঁ বাবা, তা তো বলে দিতেই হবে। তবে আমাদের গ্রামে বসে কিছুই হবে না। তোমায় লন্ডনে যেতে হবে।

–আমি তো রাস্তা জানি না, মা। কাউকে চিনি না। কি করে কি করবো? ছলছল চোখে মায়ের দিকে তাকায় ডিক আর বলে–আমি তোমায় ছেড়ে কি থাকতে পারবো মা?

মায়ের চোখে জল এসে যায়। সত্যি ওইটুকু ছেলেকে কেমন করে ছেড়ে দেবে আর কেমন করেই বা সে থাকবে একা একা। কিন্তু না ছেড়েও তো উপায় নেই। কোনোদিন না খেয়ে, কোনোদিন আধপেটা খেয়ে কেমন করে বাঁচবে ওরা। ছেলেকে সাহস দিতে হবে, দিতে হবে উৎসাহ, তাই বললে–তোমাকে একা ছাড়তে কি আমারই ইচ্ছা হয় বাবা? কিন্তু না ছেড়েই বা উপায় কি? গ্রামে থেকে না খেয়ে মরতে হবে। তুমি পুরুষ মানুষ। বড় হচ্ছ। কাজকর্ম করবে, কত পয়সা উপায় করবে। তোমার সাধ-আহ্লাদ মেটাবে, আমার দুঃখ ঘুচে যাবে।

–কিন্তু আমি যাবো কি করে? ছেলে প্রশ্ন করে।

–কত লোক লন্ডনে যায়। তাদের সঙ্গে যাবে। লোককে জিজ্ঞাসা করবে। ভালো কথায় বলবে। দেখবে তোমার মতো ছোট ছেলেকে সাহায্য করার লোকের অভাব হবে না। প্রথম প্রথম হয়তো একটু কষ্ট হবে। কিন্তু আস্তে আস্তে সব সহ্য হয়ে যাবে। পারবে না চেষ্টা করতে?

–নিশ্চয়ই পারবো মা। তুমি সব খোঁজ নিয়ে আমার লন্ডন যাবার ব্যবস্থা কর।

–তাই করছি। তুমি তোমার নিজের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নাও।

বহু কষ্ট করে খোঁজখবর নিয়ে ডিক শেষপর্যন্ত লন্ডনে এসে পৌছাল। অনেক রাস্তা হেঁটে এসে বড়ই ক্লান্ত সে। রাতে থাকার ব্যবস্থা করা তার প্রথম কাজ। কিন্তু তা আর পেরে উঠল না। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য রাস্তার ধারে এক বাড়ির সিঁড়ির ওপর গিয়ে বসল। তার সঙ্গে ছিল একটা পুঁটুলি। তাতে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো ডিক।

সন্ধ্যার কিছু আগে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক প্রৌঢ় ব্যবসায়ী। রাস্তার ধারে ছেলেটিকে ঘুমাতে দেখে কেমন মায়া হলো তাঁর। সাধারণ ভিখারী নয় বলেই মনে হলো। তাই ওকে ডেকে তুললেন। ঘুম ভেঙে অবাক চোখে তাকালো ডিক। ব্যবসায়ী জিজ্ঞাসা করলেন–কে তুমি? কোথা থেকে আসছো?

–আমার নাম ডিক। আমি গ্রাম থেকে কাজের খোঁজে এসেছি। আমার মায়ের বড় কষ্ট। কথা ক'টা বলে ব্যবসায়ীর দিকে তাকালো ডিক।

–তুমি যে বড় ছেলেমানুষ! যাই হোক, আমার সঙ্গে যাবে? আমার দোকানে টুকিটাকি কাজ করবে?

ডিক প্রথমে কোনো জবাব না দিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলো ভদ্রলোককে। মা বলে দিয়েছে সে যেন কোনো বদ্‌লোকের পাল্লায় না পড়ে। ব্যবসায়ীকে দেখে ভালো লোক বলেই মনে হলো তার। পরে মাথা নিচু করে বললে–আমি যাবো, কিন্তু আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে আপনাকে। পারবেন তো?

–বাঃ, বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পার তো! আমার কাছে গিয়ে ভালোভাবে থাকলে, তোমার সব ভাবনাই আমার।

–কিন্তু আমার মাকেও যে কিছু কিছু পয়সাকড়ি পাঠাতে হবে। না হলে মা খেতে পাবে না।

–হ্যাঁ, সব ব্যবস্থাই করা হবে। এখন আর দেরি না করে চল আমার সঙ্গে।

আনন্দে দুলে উঠলো ডিকের মন। সারাদিনের কষ্ট যেন কোথায় চলে গেল। আঙুল দিয়ে বুকে ক্রশ এঁকে ঈশ্বরপুত্র যীশুকে স্মরণ করলো ডিক। তারপর নিজের পুঁটুলি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সব লক্ষ্য করলেন ব্যবসায়ীটি। খুবই খুশি হলেন তিনি ডিকের ওপর।

ব্যবসায়ীর দোকানে ভালোই কাটছিল ডিকের। কিন্তু দোকান যখন বন্ধ থাকত, তখন একা একা খুবই খারাপ লাগত।

একদিন রাস্তার ধারে একটা বাচ্চা বেড়ালকে দেখতে পেল ডিক। ঠান্ডায় বেচারা জড়সড় হয়ে পড়েছিল। ডিক গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে এল। তারপর থেকে বেড়ালটি হলো ডিকের নিত্যসঙ্গী। নিজের খাবার থেকে কিছু কিছু খেতে দেয় ওকে আর নিজের বিছানায় নিয়ে শোয়।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক মাসে মাসে ডিকের মাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন। ডিক তার হাতখরচের পয়সা থেকেও কিছু করে জমায়। এমনি করে ক'টা টাকা জমিয়ে ডিক একদিন সেই টাকা পরিচিত একজনকে দিয়ে মাকে পাঠিয়ে দিলে শীতের পোশাক কেনার জন্যে। ঠিক সেইদিন সন্ধ্যায় ব্যবসায়ী বাড়ি ফিরে তাঁর ছোট মেয়ে এলিসকে জানালেন যে, অন্য এক ব্যবসা করতে গিয়ে তাঁর টাকাপয়সা সব লোকসান হয়ে গেছে। এখনই কিছু মালপত্র নিয়ে বিদেশে না গেলে খেয়ে-পরে বাঁচা যাবে না। কিন্তু জাহাজ ভাড়ার টাকাপয়সা কিভাবে যোগাড় হবে–সেই নিয়েই তাঁর চিন্তা।

সব কথা শুনে ভাবনায় পড়লো ডিকও। কিন্তু ছোট এলিসের অত ভাবনা নেই। সে বলে উঠল–জাহাজ ভাড়ার টাকার জন্যে ভাবনা কি বাবা! আমার হার, দুল, বালাগুলো বিক্রি করলে তো অনেক টাকা পাওয়া যাবে। ওগুলো তুমি নিয়ে যাও।

–লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। কি করে তোমার গয়নাগুলো নিই বল তো মা? কাতর কণ্ঠে বলে ওঠেন ব্যবসায়ী।

–কেন? তুমিই তো কিনে দিয়েছ। আবার যখন পারবে তখন কিনে দেবে।

এলিসের কথা শুনে ব্যবসায়ীর মনে পড়ে তাঁর স্ত্রীর কথা। সে বেঁচে থাকলে এলিসের মতোই কথা বলত। মায়ের মতোই হয়েছে মেয়ে। ব্যবসায়ীর চোখ ছলছল করে ওঠে মেয়ের কথায়। মেয়েকে দু-হাতে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, বেশ, তাই হবে এলিস। তুমি আর ডিক কদিন একলা থাকবে। রাঁধুনী মাসি রান্না করে দেবে তোমাদের। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো আমি। পারবে না থাকতে?

–পারবো, কিন্তু ডিক যখন দোকানে থাকবে তখন একা একা বাড়িতে হয়তো খারাপ লাগবে বাবা।

–দোকান এখন বন্ধ থাকবে। আমি ফিরে এলে তারপর আবার নতুন ব্যবস্থা করা যাবে। এই বলে ব্যবসায়ী তাকালেন ডিকের দিকে।

ডিক তখন অন্য কথা ভাবছিল। তার কাছে কিছুই নেই। ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা না পেয়ে শেষে সে ব্যবসায়ীকে বললো, আপনি যদি আমার বেড়ালটাকে সঙ্গে নিয়ে যান, তাহলে ওকে বিক্রি করে দু-চার টাকা পেতে পারেন। ছেলেমানুষ ডিক তার একমাত্র সম্বলটি দিয়েই সাহায্য করতে চাইলো।

ব্যবসায়ী বললেন, তা নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু.....

ডিক তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, দোকান তো বন্ধ থাকবে। বাড়িতে এলিসের সঙ্গে খেলা করে, গল্প করে সময় কেটে যাবে আমার। বেড়াল না থাকলেও কোনো অসুবিধা হবে না।

–তা সত্যি। ঠিক বলেছ ডিক। বেড়ালটা আমার সঙ্গে থাকলে ভালোই হবে। তোমরা তবে গল্প কর। আমি যাবার সব ব্যবস্থা করি গিয়ে।

এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশ যাত্রা করলেন এলিসের বাবা। ডিক মনে কষ্ট পাবে বলে ডিকের বেড়ালটিকেও সঙ্গে নিলেন তিনি। কে জানে কিসের থেকে কি হয়!

সত্যি কিসের থেকে কি হয় কেউ বলতে পারে না। হঠাৎ সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠলো। ঝড়ের দাপটে জাহাজ কাত হয়ে পড়লো। যাত্রীরা কে কোথায় ভেসে গেল সমুদ্রের জলে। কিছুদূরেই এক বন্দর দেখা যাচ্ছিলো। যারা সাঁতার জানত তারা সাঁতরাতে সাঁতরাতে তীরের দিকে যাবার চেষ্টা করলো। ব্যবসায়ী ও তাঁর বন্ধু কোনোমতে তীরে গিয়ে উঠলেন। জলে ভিজে আর ঠান্ডায় একেবারে জমে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল তাঁদের।

ডাঙায় উঠে ব্যবসায়ী তাঁর বন্ধুকে বললেন–আমাদের সবই জলে হারালাম।

বন্ধু বললেন–না, সব হারাইনি আমরা।

–কি রকম? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন ব্যবসায়ী।

–ঐ যে দেখ না,–বলে তীরের একদিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন তিনি।

সেইদিকে তাকিয়ে ব্যবসায়ী বললেন, আহাঃ! বেচারা বেড়াল। ওর কপালেও দেখছি আমাদের মতো অনেক দুঃখ আছে। চল ওকে সঙ্গে নিয়েই শহরের দিকে যাওয়া যাক।

ভিজে জামাকাপড় গায়েই শুকোতে লাগলো। বেড়ালটিকে কোলে নিয়ে ব্যবসায়ী ও তাঁর বন্ধু চললেন শহরের দিকে আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু মুশকিল হলো ভাষা নিয়ে। তাঁদের কথা কেউ ভালো বুঝছে না। তবে জাহাজডুবির খবর শহরে পৌছেছিল। তাই শহরের কয়েকজন লোক খানিকটা আন্দাজে তাঁদের কথা বুঝে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কি কথাবার্তা বললো। তারপর একজন লোকের সঙ্গে তাদের পাঠিয়ে দিল। লোকটিকে পাহারাদার বলে মনে হলো ব্যবসায়ীর।

পাহারাদার তাঁদের এনে তুললো শহরের মাঝখানে রাজবাড়িতে। সমস্ত ব্যাপার শুনে রাজামশাই তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথমেই ভিজে কাপড় বদলাবার জন্যে পোশাক দেওয়া হলো। তারপর একটা ঘর খুলে দেওয়া হলো তাঁদের থাকার জন্যে। ব্যবসায়ীদের জানানো হলো যে তাঁরা নেদারল্যান্ডে এসে পৌছেছেন।

পোশাক পরে ওঁরা ঘরে এসে বসলে সেই ঘরেই খাবার ব্যবস্থা করা হলো। একজন লোক টেবিলে নানারকম খাবার এনে রাখলো। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক অদ্ভুত কান্ড ঘটলো। খাবারের গন্ধ পেয়ে কোথা থেকে দলে দলে ইঁদুর ছুটে এসে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ব্যাপার দেখে ব্যবসায়ী ও তাঁর বন্ধু তো অবাক। বন্ধু ব্যবসায়ীকে বললেন–চুপ করে বসে থাকলে হবে না। ইঁদুর তাড়াও।

–কিন্তু যদি কামড়ে দেয়? কি বিরাট ইঁদুর দেখছ? ব্যবসায়ী বললেন।

অতিথিদের থাকা-খাওয়ার কেমন ব্যবস্থা হয়েছে দেখার জন্যে সেই সময় রাজামশাই এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্যে ব্যবসায়ী ও তাঁর বন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীর কোল থেকে লাফিয়ে পড়লো বেড়ালটি। অনেকক্ষণ কোলের গরমে থেকে খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল সে। এবার খাবারের গন্ধ পেয়ে টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠলো।

রাজামশাই ও তাঁর সঙ্গীরা দেখলেন–টেবিলের খাবারগুলো ইঁদুরেই শেষ করছিল। কিন্তু আগন্তুকের আনা জন্তুটি ইঁদুরের ঘাড়ে পড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলো তাদের। কাউকে খাচ্ছে, কাউকে মারছে। তাড়া খেয়ে ছুটে পালাতে আরম্ভ করলো ইঁদুরগুলো।

ব্যাপার দেখে খুব খুশি হলেন রাজামশাই। তাঁদের দেশে বেড়াল ছিল না বলেই ইঁদুরদের উৎপাত খুব বেড়ে গিয়েছিল। তিনি ব্যবসায়ী ও তাঁর বন্ধুর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

অতিথি দুজন যখন খান-দান আর শহর দেখে বেড়ান, ওঁদের বেড়াল তখন রাজবাড়ির ইঁদুর ধ্বংস করে। রোজ বহু লোক এসে বেড়ালটিকে দেখে যায়। রাজামশাই বিকালের দিকে একটা সময় ঠিক করে দিয়েছেন বেড়াল দেখার জন্য।

কয়েকদিন নেদারল্যান্ডে থেকে ওদেশের ভাষা কিছুটা বুঝতে শিখেছেন অতিথিরা। এখন কিভাবে লন্ডনে ফিরে যাওয়া যায় তারই খোঁজখবর করতে লাগলেন। শেষে খবর পেলেন কয়েকদিন পরেই একটা জাহাজ যাচ্ছে লন্ডনে। রাজামশাই ওঁদের ফিরে যাওয়ার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বেড়ালটি ক'দিনে রাজবাড়ির ইঁদুর প্রায় সাবাড় করে দিয়েছিল। অতিথিরা চলে গেলে বেড়ালও আর থাকবে না। তখন আবার ইঁদুরের উপদ্রব বেড়ে যাবে। রাজা ঠিক করলেন

বেড়ালটিকে কোলে নিয়ে ব্যবসায়ী চললেন শহরের দিকে।

উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তিনি বেড়ালটি কিনে নেবেন। আর ব্যবসায়ীর সঙ্গে লোক পাঠিয়ে দেবেন লন্ডন থেকে আরও কিছু বেড়াল কিনে আনতে।

টাকার খুবই দরকার ব্যবসায়ীর। কিন্তু তবুও ছেলেমানুষ ডিকের বেড়ালটি ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না তাঁর। তাঁর বন্ধু তাঁকে বোঝালেন–টাকা পেলে ডিককে আর একটা ভালো বেড়াল কিনে দেওয়া যাবে।

শেষে রাজার কথায় রাজী হলেন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক। রাজার রাজকীয় ব্যাপার! বেড়ালের মূল্য হিসাবে পঞ্চাশ থলি সোনার মোহর দিলেন। আর সঙ্গে দুজন লোককে পাঠালেন আরও কিছু বেড়াল কিনে আনার জন্যে। মনের আনন্দে বন্ধুর সঙ্গে দেশে ফিরলেন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক।

অনেকদিন পরে বাবাকে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এলিস। খুশি হলো ডিকও। সন্ধ্যাবেলায় আগুনের পাশে বসে তাঁর বিদেশ ভ্রমণের গল্প বলতে লাগলেন ব্যবসায়ী। সব গল্প বলে তিনি ডিককে বললেন–পঞ্চাশ থলি মোহর সবই তোমার। এখন কি করবে বল এই টাকা নিয়ে?

কি জবাব দেবে ডিক! আনন্দে ওর মুখে কোনো কথা যোগাল না।

–কই জবাব দাও ডিক। ঐ টাকা তো তোমার বেড়াল বিক্রীর।

–টাকা আপনি এনেছেন। ঐ টাকায় আপনারও ভাগ আছে। আপনার অর্ধেক, আমার অর্ধেক। টাকা নিয়ে আমি কি করবো, তার পরামর্শও তো আপনাকেই দিতে হবে।

ডিকের কথা শুনে আনন্দে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ব্যবসায়ী বলে উঠলেন–লক্ষ্মী ছেলে তুমি ডিক। তোমার জন্যেই আমি আবার ব্যবসা করে ভদ্রলোকের মতো বাঁচতে পারবো।

ছোট্ট মেয়ে এলিস অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ডিকের দিকে। অত টাকার অর্ধেক দিয়ে দেবে তার বাবাকে!

–তুমি তাহলে কালই বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা কর ডিক। আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো। বললেন ব্যবসায়ী।

–ডিক কালই চলে যাবে বাবা? প্রায় ধরা গলায় প্রশ্ন করলো এলিস।

–হ্যাঁ, এলিস। ডিক অনেকদিন বাড়িছাড়া। একবার মাকে দেখে আসুক।

–তুমি যদি ওকে দিতে যাও, তাহলে আমাকেও নিয়ে চল না। আমি ওদের গ্রামের বাড়ি দেখে আসবো।

–হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালই বলেছ। চল সকলে মিলেই ডিকের বাড়ি ঘুরে আসা যাক।

তারপর গ্রামের বাড়ি গিয়ে ডিক কিভাবে ব্যবসা আরম্ভ করবে সেইসব যুক্তি পরামর্শ করলেন ব্যবসায়ী। সব ব্যাপারে তাঁকেই যে সাহায্য করতে হবে ডিককে।

দুঃখের দিন কেটে গেছে। এর পরের ঘটনা সবই আনন্দের। ডিক যে ছোট্ট দোকান করেছিল–তা বেশ বড় হয়েছে। সুচিকিৎসা ও পথ্য পেয়ে ডিকের মা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ব্যবসায়ী ভদ্রলোকই লন্ডন থেকে ডিকের মালপত্র কিনে দেন। সপ্তাহে একদিন দোকান বন্ধ থাকে। সেদিন ডিক সকালে লন্ডন চলে যায়। সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় গ্রামে ফিরে আসে।

ছোট্ট এলিস এখন বেশ বড় হয়েছে। ডিকের মা বলেছেন–সামনের নববর্ষে ডিকের সঙ্গে এলিসের বিয়ে দেবেন। এলিসের বাবা এ প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হয়েছেন। খুশি হয়েছে এলিসও।

বিদেশী গল্পের ছায়ায় রচিত।

ছবি ঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ

অলৌকিক

কমল লাহিড়ী

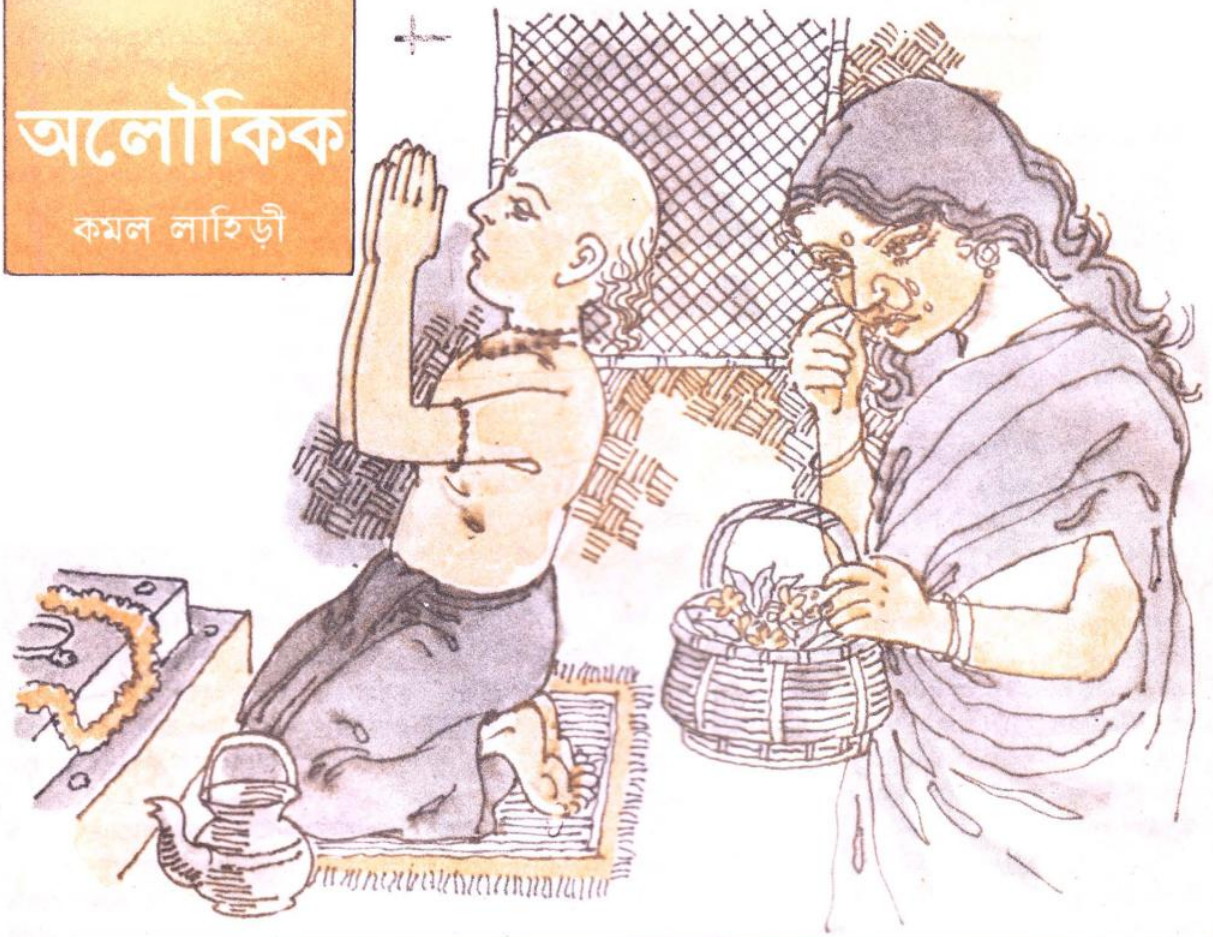

আথুলোয়

এবার একটি ছোট্ট মেয়ের কাহিনী। বৈষ্ণব সমাজে যে ছোট্ট মেয়েটির নাম আজও বিনম্র চিত্তে সবাই স্মরণ করে, দক্ষিণ ভারতের মেয়ে সেই আথুলোয় সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের কাছে আদরণীয়া। তার কথা সবাই ভক্তিভাবে মনে করে। শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখে আথুলোয়র শুধু গুণকীর্তনই নয়–তার সঙ্গে প্রভু রঙ্গনাথের যে বিস্ময়কর অপার লীলা হয়েছিল সেই মধুর লীলাগাথাও সবাই ভক্তিনম্র চিত্তে শোনে।

আজ থেকে বহু বছর আগেকার কথা। সেই একাদশ শতকে জন্মগ্রহণ করেছিল আথুলোয়। পরম ভক্ত পেরিয়া নাম্বির মেয়ে আথুলোয়। দক্ষিণ ভারতেই শুধু নয়, শ্রীপাদ রামানুজ ছিলেন সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য। আর এই পেরিয়া নাম্বি ছিলেন আচার্য রামানুজের গুরুস্থানীয়। তাই পেরিয়া নাম্বি সবারই আদরণীয় ছিলেন। আর তিনি নিজে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপাসকও ছিলেন। সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে পৌঁছে পেরিয়া নাম্বি মানুষের মঙ্গলসাধনের পথই খুঁজে পেয়েছিলেন।

মানুষের সেবার মধ্যেই শ্রীবিষ্ণুর পূজা আর সেবা খুঁজে পেতেন পেরিয়া নাম্বি। আর মানুষের এই সেবা কাজে তাঁর কাছে কোনো জাতিভেদের বাছবিচার ছিল না। মিথ্যে পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে শুধু নিজের মুক্তির কথা ভাবতেন না পেরিয়া নাম্বি। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল সব মানুষকেই ভগবান বিষ্ণুজ্ঞানে সেবা করতেন।

পেরিয়া নাম্বির গুরুদেব ছিলেন সন্ত আলাভান্দা। সন্ত আলাভান্দার আরও একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তিনি মারানের নাম্বি। তবে এই মারানের নাম্বি ছিলেন সমাজের নিচু সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু সন্ত আলাভান্দার শিষ্যদের মধ্যে কোনও উঁচুনিচু ভেদাভেদ ছিল না। তাছাড়া মারানের নাম্বির মতো অমন ভক্ত মানুষের কাছে একবার দাঁড়ালেও মনপ্রাণ ঈশ্বরে যুক্ত হয়ে যেত।

পেরিয়া নাম্বি আর মারানের নাম্বির মধ্যে সম্পর্কও ছিল খুব মধুর। দু'জনাই গুরু সন্ত আলাভান্দার নির্দেশমতো মানুষের সেবাকেই ভগবানের পুজো বলে মনে করতেন।

গুরুদেবের নির্দেশ মেনে চলা, নিয়মমতো পুজো জপ-ধ্যান আর মানুষের মঙ্গল কামনা এই নিয়েই দিন কাটে। এইভাবেই দিন কাটছিল। কিন্তু হঠাৎই ছন্দপতন হলো।

কিছুদিন হলো মারানের নাম্বির শরীরটাও ভালো যাচ্ছিল না। আর বয়সও তো হয়েছে। পরিশ্রমের ফলেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সমস্ত শরীরে একটা তীব্র যন্ত্রণা শুরু হলো। হাঁটাচলাও করতে পারেন না। বিছানায় শুয়েই গুরুদেবের

কাছে সব ব্যথাবেদনার কথা অশ্রুসজল নয়নে বারবার নিবেদন করেন।

পেরিয়া নাম্বি তাঁর গুরুভাইয়ের এই অসুস্থতার সংবাদ লোকমুখে শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে ওঠেন। এমন পরম ভক্তের একি কষ্ট! খাওয়াদাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে! সব কথা শুনে পেরিয়া নাম্বি আর চুপ করে থাকতে পারেন না। ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করে মারানের নাম্বির কাছেই ছুটে যান।

তারপর জাতপাতের বিচার ভুলে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে অসুস্থ মারানের নাম্বির সেবায় লেগে পড়েন। নিজের পুজো-জপ মাথায় উঠল। প্রতিদিন নিয়ম করে মারানের নাম্বিকে স্নান করিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে বসিয়ে দিতেন। তারপর ঘর পরিষ্কার করে রান্নার ব্যবস্থা শুরু করতেন। গুরুভাইয়ের সেবাতে কোথাও যেন কোনও ত্রুটি না থাকে সেদিকে ছিল কড়া নজর।

মারানের নাম্বির আপনজন বলতে কেউই ছিল না। তাই তাঁর সবকিছুর ভারই নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন পেরিয়া নাম্বি। দীর্ঘদিন এইভাবে থেকে অবশেষে একদিন কালের অমোঘ নিয়মে মারানের নাম্বি ইহলোক ত্যাগ করলেন। এবার তাঁর শেষ কাজগুলোও নিয়মনিষ্ঠা মেনেই শেষ করলেন পেরিয়া নাম্বি। সৎকার থেকে শুরু করে পারলৌকিক আচার অনুষ্ঠান সবকিছুই করতে হলো।

সব শেষ হয়ে যাবার পরই শুরু হলো এক প্রচন্ড আলোড়ন। সমাজের পন্ডিত ব্যক্তিরা রাগে জ্বলে উঠলেন। এ কি অনাচার! পেরিয়া নাম্বি নিজে ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে একজন নীচ বংশের লোকের সেবাই শুধু নয় তার পারলৌকিক কাজও করলেন! কাজেই তাঁর আর সমাজে থাকার অধিকার নেই। শ্রেষ্ঠ পন্ডিত হয়ে যিনি এই ধরনের কদর্য কাজ করতে পারেন তাঁর সঙ্গে আর বসবাস করা চলে না। পন্ডিত সমাজের বিধান হলো পেরিয়া নাম্বি সমাজচ্যুত হয়েছেন।

পন্ডিত সমাজ কিন্তু বিধান ঘোষণা করেই শান্ত হলেন না। তাঁরা পেরিয়া নাম্বির ঘরের দরজা মাটি আর কাঁটাগাছ দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। সব দেখে আর শুনেও পেরিয়া নাম্বি কিন্তু নির্বিকার। তিনি তাঁর মেয়ে আথুলোয়কে নিয়ে ঘরে বসেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

শত অত্যাচারেও অন্যায়ের কাছে কিছুতেই মাথা নিচু করবেন না পেরিয়া নাম্বি। অন্ধ কুসংস্কারের ফলে সমাজের এই যে জাতপাতের বেড়াজাল সেটা যে তিনি ভেঙে ফেলতে পেরেছেন তাই তাঁর পরম লাভ। কিসের জাত! সব মানুষই তো ভগবানের সন্তান। আর এই সত্যকে ভুলে গিয়ে শুধু নিজের স্বার্থ দেখাটা কি ঈশ্বরের আরাধনা!

ঘরের মধ্যে বসেই একমনে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে নিজের সব কথা জানতে লাগালেন পেরিয়া নাম্বি। দুই হাত যুক্ত করে প্রার্থনা করলেন, 'হে নারায়ণ, হে মধুসূদন তুমি তো সবই জান প্রভু। মারানের নাম্বিও তো আমার মতো তোমারই সন্তান। আর শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাই তার সেবা করে আমি কোনও পাপ করিনি। আর যারা আমাকে ঘরে বন্ধ রেখে শাস্তি দিচ্ছে তাদের উপরও আমার কোনও ক্ষোভ নেই। সবাইকে মঙ্গল পথের সন্ধান দাও ঠাকুর। সবার ভালো কর তুমি।' প্রার্থনা করতে করতে দু'চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

আথুলোয় পাশে বসে বাবার সব কথা শোনে আর চোখের জল মোছে। সব বুঝেও কিছু করতে পারে না। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপর খুব অভিমানও হয় মাঝে মাঝে। সামনের দরজা বন্ধ থাকলেও আথুলোয় চুপি চুপি পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। তারপর বাবার পুজোর জন্য বাগান থেকে ফুল তুলে আনে। জল এনে দেয়। কয়েকদিন যাবার পর ছোট্ট মেয়ে আথুলোয়কে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দেয় সবাই। সত্যিই তো এই মেয়েটার কি দোষ! ওর বাবা নাহয় নীচ কাজ করেছে। তাই ওর কোনও কাজে কেউ বাধা দেবে না।

পন্ডিত সমাজের বিধান শুনে মনে মনে রাগে দুঃখে অভিমানে ফেটে পড়ে আথুলোয়। ভগবান বিষ্ণুর কাছেই সবসময় এই অপমানের প্রতিশোধের কথা জানায়। পরমভক্তের এই লাঞ্ছনা দেখে ভগবানও আর স্থির থাকতে পারেন না। এবার শুরু হয় ঈশ্বরের এক অপার করুণাঘন লীলা।

প্রতিবছরের মতো শ্রীরঙ্গনাথের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে রাস্তায়। বিশাল সেই শোভাযাত্রা লোকে লোকারণ্য। শহরের সব রাস্তা ঘুরে একসময় শ্রীরঙ্গনাথের রথ এসে পৌঁছায় আথুলোয়দের বাড়ির সামনের রাস্তায়। অভিমান করে ঘরেই বসেছিল আথুলোয়। কিন্তু বাড়ির সামনে স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথ এসেছেন, আর কি ঘরে বসে থাকা যায়! ছুটে ঘরের বাইরে আসে আথুলোয়।

ভিড় সরিয়ে সেই চলন্ত রথের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় আথুলোয়। কেউ কিছু বোঝার আগেই সব ঘটে যায়। স্থির অপলকে শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে আথুলোয়। তারপর দুই হাত যুক্ত করে প্রণাম করে। সমস্ত মানুষ হঠাৎই যেন বোবা হয়ে যায়। কারও মুখেই কথা ফোটে না। আর অবাক কান্ড– শত টানাটানিতেও শ্রীরঙ্গনাথদেবের রথ একটুও নড়ে না। যেমন দাঁড়িয়েছিল ঠিক তেমনি থাকে।

সমস্ত পূজারী ব্রাহ্মণ হায় হায় করে ওঠেন। একি অনাচার। এমন তো হয় না। এ যে অসম্ভব ঘটনা। প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের রথ থেমে যাওয়া মানেই তো ঘোর অমঙ্গল।

আথুলোয় কিন্তু সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এবার সমস্ত শোভাযাত্রার মানুষদের দিকে একবার ঘুরে দেখে আবার শ্রীরঙ্গনাথদেবের দিকেই তাকায় আথুলোয়। তারপর হাতজোড় করে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'হে প্রভু রঙ্গনাথ, তুমি যদি সত্যি ভক্তের ভগবান হও আর ত্রিলোকের নাথ হও তাহলে বিচার কর এই ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের, যারা বিনা দোষে আমার বৃদ্ধ পিতাকে সমাজচ্যুত করে ঘরে বন্দী করে রেখেছে।

কথা শেষ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আথুলোয়।

আমার বাবা তো তোমারই একনিষ্ঠ সেবক–তোমার কাছে তো মানুষের কোনও জাত নেই। তাহলে আমার বাবা কি এমন অপরাধ করেছেন পরম ভক্ত মারানের নাম্বির সেবা করে যে তাঁকে জাতচ্যুত হতে হলো! এই কি তোমার বিধান! তুমি যদি সত্যি মানুষের ভগবান হয়ে থাক তাহলে আমার এই কথার জবাব না দিয়ে এখান থেকে যেতে পারবে না।' কথা শেষ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আথুলোয়।

ঘটনার আকস্মিকতায় সমস্ত জনতা হতবাক হয়ে যায়। শ্রীরঙ্গনাথদেবের রথ একটুও নড়ে না। আথুলোয়র কথা শুনে সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকায়। এই ছোট্ট মেয়েটির অভিযোগ খণ্ডন করার সাহসও কারও নেই।

সবাই যখন ভীতিবিহ্বল হয়ে ভাবছে এখন কি করা কর্তব্য, ঠিক সেই সময় শ্রীরঙ্গনাথদেবের শ্রীমূর্তি থেকে এক বজ্রনির্ঘোষ অপার্থিব কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। বিস্মিত হতবাক পূজারী আর পণ্ডিতেরা শোনেন শ্রীরঙ্গনাথদেব আদেশ করছেন, 'তোমরা সবাই অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ। মারানের নাম্বির সেবা করে পেরিয়া নাম্বি কোনও পাপ করেনি। বরং আমার যথার্থ সেবাই সে করেছে। তাই তাকে ঘরে বন্দী করে তোমরাই পাপের ভাগী হয়েছ। এক্ষুণি যদি পেরিয়া নাম্বিকে কাঁধে করে আমার সামনে হাজির না কর তাহলে আমি এখানেই থেকে যাব।'

শ্রীরঙ্গনাথদেবের আদেশ শেষ হতেই একটা গুঞ্জন ওঠে। আথুলোয় সেই একইভাবে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। আর কোনও দ্বিধা বা দ্বন্দ্বেরও অবকাশ থাকে না। নিমেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মত ঠিক করে নেন। আর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা আন্দাল প্রভুর নাম করতে করতে দৌড়ে যান পেরিয়া নাম্বির ঘরের দিকে। একটু পরেই কাঁধে করে আন্দাল নিয়ে আসেন পেরিয়া নাম্বিকে। আনন্দে এবার উঠে দাঁড়ায় আথুলোয়। তার প্রার্থনা যে শ্রীরঙ্গনাথ শুনেছেন এই তার চরম আনন্দ। আর বিদগ্ধ বৈষ্ণবসমাজের কাছে তার বাবা যে কোনও পাপকাজ করেননি শ্রীরঙ্গনাথদেব সে কথাও বুঝিয়ে দিলেন!

পেরিয়া নাম্বি শ্রীরঙ্গনাথদেবের রথের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা শুরু করতেই আবার চলতে শুরু করে শোভাযাত্রা। সমস্ত মানুষ একসঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে–'জয় শ্রীরঙ্গনাথ, জয় শ্রীবিষ্ণু–'। পেরিয়া নাম্বি আর আথুলোয়কেও সবাই কাঁধে করে উঠিয়ে নেয়।

মানুষের সেবাই যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা। আর তার মধ্যেই তাঁর পূজা-জপ-আরাধনা সে কথাই আর একবার প্রমাণিত হয়। সেই থেকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলে চিহ্নিত হন পেরিয়া নাম্বি। বৈষ্ণব সমাজে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় জাতপাতের বেড়াজাল। ছোট্ট মেয়ে আথুলোয়র নিষ্ঠা আর ভক্তিই শ্রীরঙ্গনাথদেবের পাষাণ বিগ্রহতে প্রাণ সঞ্চার করে এই বিধান সবাইকে শুনিয়ে দেয়।

কত বছর কেটে গেছে কিন্তু আজও দক্ষিণ ভারতে শ্রীরঙ্গনাথদেবের সঙ্গে এই ভক্তিমতী আথুলোয়র নাম জড়িয়ে আছে।

ছবি ঃ দিলীপ দাস

রাজুর জাগলিং শেখা

অভয় মিত্র

ছোট ভাইবোনেরা তোমরা নিশ্চয় ম্যাজিসিয়ান পি সি সরকার জুনিয়ারের নাম শুনেছো। তাঁর তৈরি মল্লিকপুরে পি সি মঞ্চে জাগলিং খেলা দেখাতে গিয়েছিলাম আমি আর আমার মেয়ে মৌসুমী। মঞ্চের পাশে লোহার তৈরি একটা ঘরে বিরাট একটা সিংহ আছে। যেমন তার চেহারা তেমনি তার গর্জন। মঞ্চের সামনে একটা মাঠ। মাঠের পাশে ফুলবাগান। আশেপাশে আমের গাছ, পেয়ারার গাছ, লিচুর গাছ প্রভৃতি আছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি ছিল প্রতুলচন্দ্র সরকারের জন্মদিন। প্রত্যেক বছরের মতো এবারেও ঐ দিনটি সাড়ম্বরে পালন করলেন পি সি সরকার জুনিয়ার। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও ছিল জাগলিং খেলা।

বহু ছেলেমেয়ে, কিশোর-কিশোরী, পুরুষ-মহিলার সমাগম হয়েছিল সেদিন। বিকালবেলা আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম বাড়ির সামনে। বেশ কয়েকজন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটে এলো আমাদের গাড়ির কাছে। আমাদের দেখে আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলো। গেটের ভেতরে ঢুকতেই প্রথমে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালো সেই সিংহটি। তার ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটা আভিজাত্য ছিল। মৌসুমী আর আমি সিংহটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিসম্ভাষণ জানালাম। সিংহটি রাজকীয় ভঙ্গিতে হেঁটে খাঁচার অন্যধারে চলে গেল। তারপর মঞ্চের সামনে যেতেই একটা মস্তবড় হাতি এসে শুঁড় নেড়ে আমাদের নমস্কার জানালো। হাতির শুঁড়ে আমি হাত বুলিয়ে দিলাম।

বিরাট মঞ্চ। মঞ্চের উপর প্রতুলচন্দ্র সরকারের একটি বড় ছবি। ছবিতে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি মালাদান করলেন। দুই একজন বক্তৃতা দিলেন। তারপর আমাদের জাগলিং খেলা শুরু হলো।

মঞ্চের ওপর জাগলিং খেলা হচ্ছে আর মঞ্চের পাশ থেকে সিংহের গর্জন ভেসে আসছে। দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ একবার খেলার দিকে আবার একবার মঞ্চের পাশের পর্দা ঘেরা জায়গার দিকে তাকাচ্ছিলেন। বোধহয় ভয় পাচ্ছিলেন, এই বুঝি সিংহমশাই লাফিয়ে এসে পড়ে মঞ্চের ওপরে। দুই একটি খেলা দেখাবার পর আমরা শুরু করলাম ফিতের খেলা। লক্ষ্য করলাম ফিতের খেলা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে দশ বার বছরের একটি ছেলে নিজের আসন ছেড়ে মঞ্চের একেবারে পাশটিতে এসে হাজির। রাজ্যের বিস্ময় আর উত্তেজনা তার চোখে। ওর খুশি দেখে আমরাও খুব খুশি হয়ে উঠলাম।

প্রায় আধ ঘন্টা ধরে খেলা দেখিয়ে যেই আমরা পাশের বিশ্রামকক্ষে গিয়ে বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে একদল ছেলেমেয়ে সেখানে এসে ঢুকল। তাদের নানান প্রশ্ন, নানান কথা। তাদের সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় সেখানে এলেন এক ভদ্রমহিলা। এসেই বললেন, নমস্কার, আমার একটা খুব জরুরি কথা আছে আপনার সঙ্গে।

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও পরে সামলে নিয়ে বললাম–বলুন।

–আপনার জন্য কি আমাদের বাড়িতে একটা অশান্তি বেধে যাবে?

–আমার জন্য আপনাদের বাড়িতে অশান্তি?

–হ্যাঁ, আপনার জন্যে। আমি না পারি চুল বাঁধতে, আমার বোন না পারে চুল বাঁধতে, আমার মেয়ে না পারে চুল বাঁধতে......

বারবার ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না–কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। একটু হেসে বললাম–ব্যাপারটা কি বলুন তো।

একটু থেমে ভদ্রমহিলা বললেন–গত বছর ২৩শে ফেব্রুয়ারী এই মঞ্চে আপনার জাগলিং দেখার পর আমার ছেলে আপনার সেই ফিতের খেলাটি বাড়িতে প্র্যাকটিস শুরু করে। আর আমাদের মাথার সবকটি ফিতে একটা ছড়ির মাথায় বেঁধে সে ফিতের নাচন রপ্ত করতে উঠেপড়ে লাগে।

হো হো করে ছেলেমেয়ের দল হেসে উঠলো। আমিও হাসি চাপতে পারলাম না। বললাম–আপনার পুত্রটি কোথায়?

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতে ভদ্রমহিলা দরজার বাইরের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন–রাজু ভেতরে আয়।

হাসিভরা মুখ নিয়ে রাজু আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। রাজুর মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম–রাজু, তুমি জাগলিং ভালোবাসো? উৎফুল্ল নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে বললো–খুব বেশি ভালোবাসি। আমাকে জাগলিং শিখিয়ে দাও না। হাসতে হাসতে বললাম–ফিতের খেলার সময় তুমি তো স্টেজের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে? হ্যাঁ–রাজু বলল।

–জাগলিং খুবই ভালো খেলা, কিন্তু বেশি ভালোবাসলে তো চলবে না। কারণ পড়াশোনাটাও তো করতে হবে। তবে বলে দিচ্ছি তোমাকে কি করতে হবে। প্রায় এক হাত একটা ছড়ির মাথায় প্রায় দশ বারো হাত একটা চওড়া ফিতের একপ্রান্ত ভালোভাবে বাঁধতে হবে। তারপর ছড়ির নিচের দিকটা ডানহাতে ভালোভাবে ধরে ফিতেটাকে নাচাতে হবে নানা ভঙ্গিমায়। বাড়িতে বা মাঠে বেশ কিছুদিন নিয়মিত অনুশীলন করলে খেলাটি সহজেই আয়ত্তে আনা যায়। মনে রেখো জাগলিং শিখলে মনে খুব আনন্দ পাওয়া যায়। খেলাটি দেখিয়ে অপরের মনেও খুব আনন্দ দেওয়া যায়।

ছবি : লেখক

বাহাদুর বেড়াল

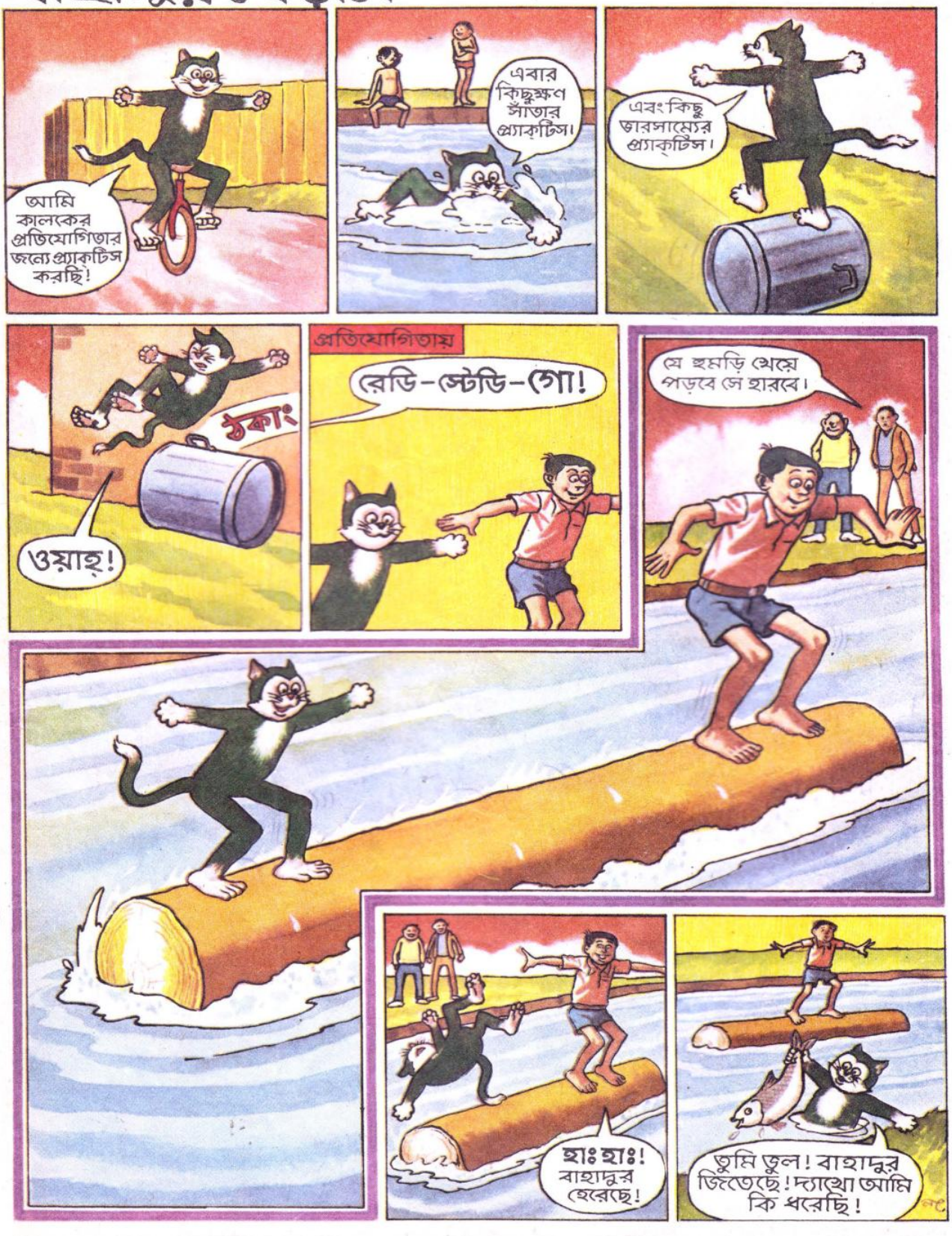
আমি কালকের প্রতিযোগিতার জন্যে প্র্যাকটিস করছি!
এবার কিছুক্ষণ সাঁতার প্র্যাকটিস।
এবং কিছু ভারসাম্যের প্র্যাক্‌টিস।
ঠকাং
ওয়াহ্!
প্রতিযোগিতায়
রেডি-স্টেডি-গো!
যে হুমড়ি খেয়ে পড়বে সে হারবে।
হাঃহাঃ! বাহাদুর হেরেছে!
তুমি ভুল! বাহাদুর জিতেছে! দ্যাখো আমি কি ধরেছি!

ভ্রমণ

বদ্রীবিশাল

শতদল ভট্টাচার্য

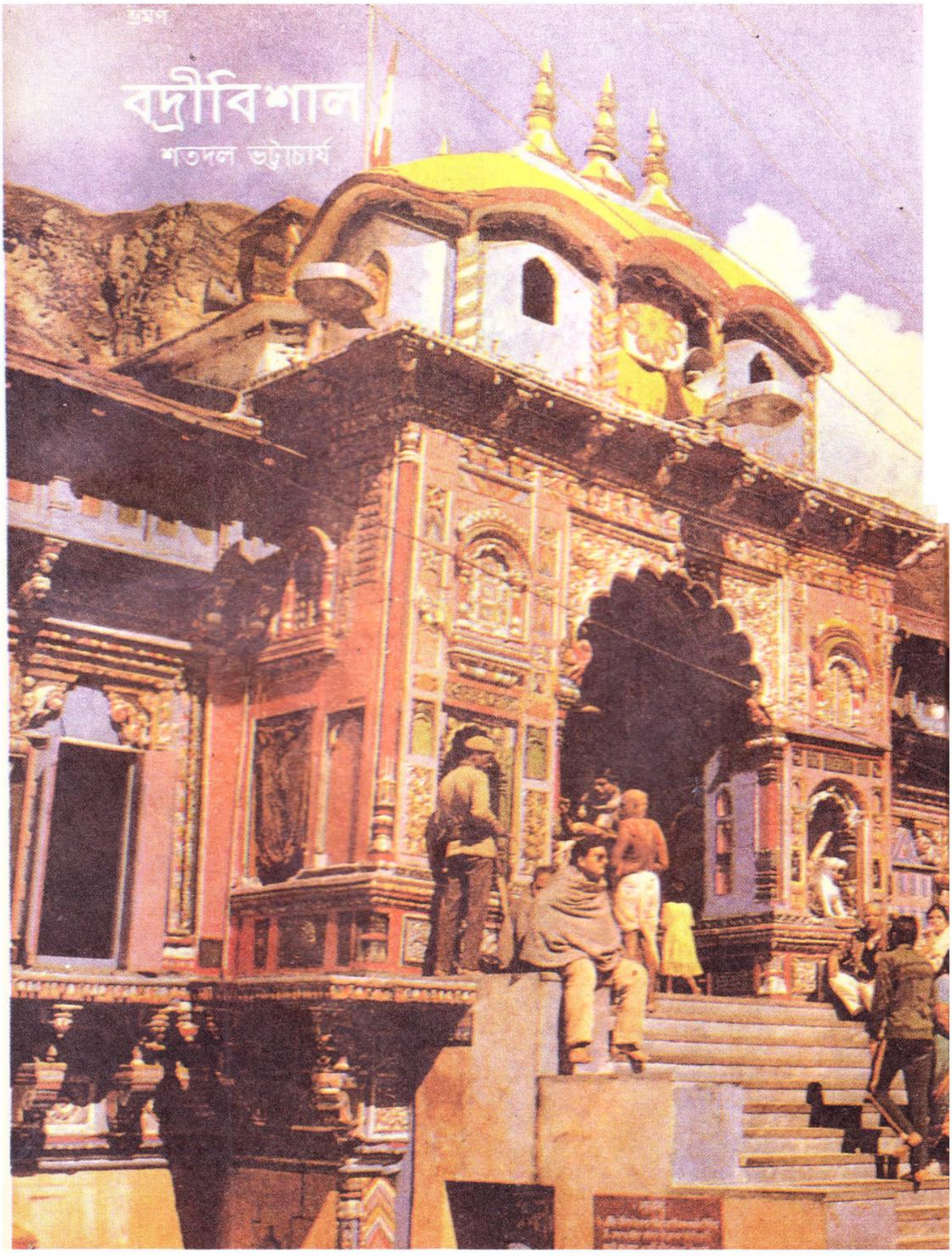

আমাদের পুরাণ গল্পে গল্পে ভর্তি। সকালবেলা বদ্রীনাথে এসে পৌঁছানর পর পুরাণের কাহিনী মনে পড়তে লাগল। সেই কাহিনী খুব চিত্তাকর্ষক। সেটি বলার আগে যেখানে রাত কাটিয়ে এলাম তার স্মৃতি এখনও আমাকে বিহ্বল করে রেখেছে, তার কথা একটু বলি। উত্তরাখণ্ডের যাত্রাপথে মহাভারতের সব কথা জড়িয়ে আছে। সে তো পাঁচ হাজার বছরের কিছু আগের ঘটনা। কিন্তু যেখানে রাত্রে বিশ্রাম করতে হলো সে জায়গার খ্যাতি ৮ম শতাব্দীর (৭৮৮ খ্রীঃ) এক দিব্য পুরুষের জন্যে। তিনি হলেন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য। দক্ষিণ ভারতের কেরালার কালাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং বাল্যকালেই সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসী হওয়ার আগের ঘটনা চমৎকার। সন্ন্যাস নিতে গেলে তাঁর মার অনুমতির দরকার। কিন্তু মা কিছুতেই অনুমতি দিচ্ছেন না। একদিন হলো কি–তিনি মার সঙ্গে নদীতে স্নান করছেন, এমন সময়ে মস্ত একটা কুমীর শঙ্করাচার্যের পা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। মা বিপদে দিশাহারা হয়ে পড়লেন–কি করে ছেলেকে রক্ষা করবেন! শঙ্করাচার্যের কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র নেই। তিনি ঐ অবস্থায় হাসি হাসি মুখে মাকে বললেন, মা, তুমি যদি আমাকে সন্ন্যাসী হওয়ার অনুমতি দাও তাহলে কুমীর আমাকে ছেড়ে দেবে। মা দেখলেন, মহা মুশকিল! মৃত্যুর চেয়ে ছেলে সন্ন্যাসী হোক। প্রাণে বাঁচুক। তিনি বললেন, তাই হবে। শঙ্করাচার্য বললেন, চেঁচিয়ে বলো, কুমীর শুনুক। মা চেঁচিয়ে বললেন, তোমায় আমি সন্ন্যাসী হওয়ার অনুমতি দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল–কুমীরটা শঙ্করাচার্যকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। শঙ্করাচার্য বেজায় খুশী। মার অনুমতি পেয়ে গেছেন। স্নান সেরে মনের আনন্দে তিনি মার সঙ্গে বাড়ি ফিরলেন।

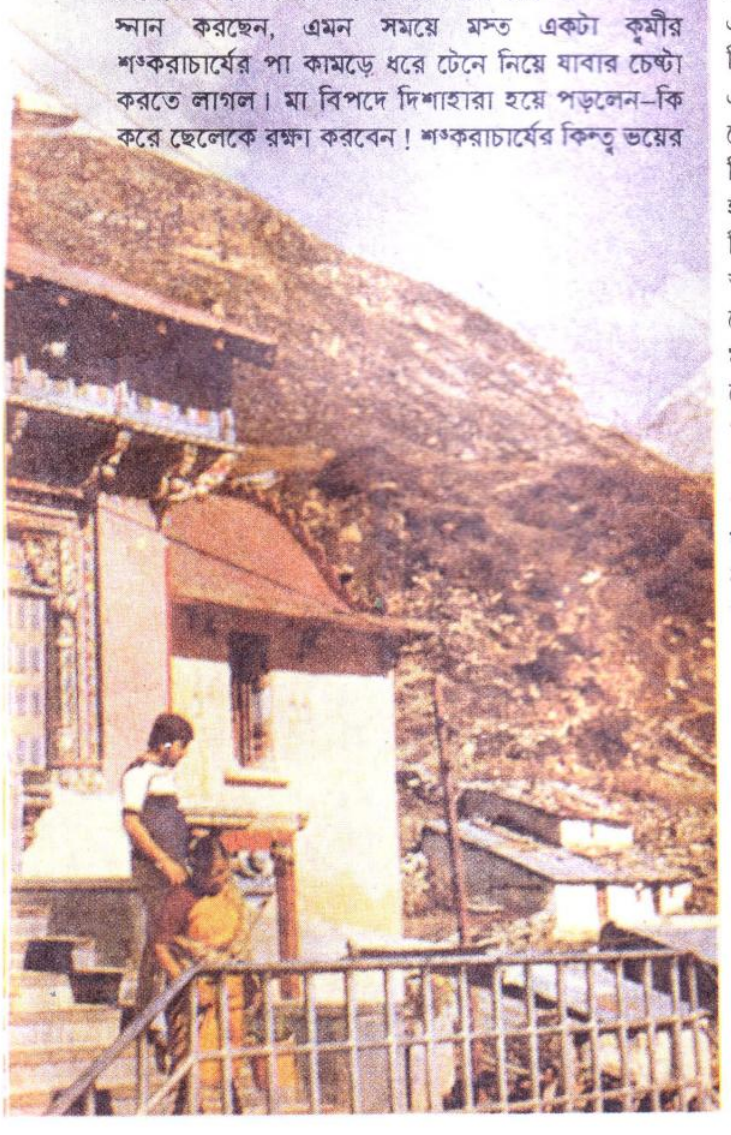

শঙ্করাচার্যের জীবনে আরও অনেক চমকপ্রদ ঘটনা আছে। কিন্তু এখন যোশীমঠের কথা। কারণ বদ্রীনাথের সঙ্গে যোশীমঠের খুব গভীর সম্পর্ক আছে। সেখানেই রাত কাটিয়ে এলাম। যোশীমঠ নামটি হয়েছে 'জ্যোতির্মঠ' থেকে। শঙ্করাচার্য এগার বছর বয়সে এখানে এসেছিলেন এবং ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন। এই পাঁচ বছর তিনি শিবের তপস্যা করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি এখানে শিবের জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করেছিলেন। তিনি যে গুহায় বসে তপস্যা করেছিলেন, সেখানে একটি শিবলিঙ্গ ছিল। তিনি দেখলেন একটি জ্যোতি আবির্ভূত হয়ে সেই শিবলিঙ্গে প্রবেশ করলেন। তিনি তখন সেই শিবলিঙ্গ গুহা থেকে বার করে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। আমরা এখন যোশীমঠে যে জ্যোতিরীশ্বর শিবমন্দির দেখি সেটিই শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের মন্দির। জ্যোতিরীশ্বর শিবের নাম থেকেই জ্যোতির্মঠ বা যোশীমঠ। নভেম্বর মাস থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বদ্রীনাথ তুষারে ঢাকা থাকে, তখন লোকজন কেউ থাকে না, মন্দিরও বন্ধ থাকে, অথচ বদ্রীবিশালের নিত্য পুজো তো বন্ধ হতে পারে না! তাই মন্দির বন্ধ হওয়ার সময়ে তাঁর প্রতীক মূর্তিটিকে যোশীমঠে এনে রাখা হয়। নরসিংহ মন্দির হচ্ছে সেই মন্দির যেখানে বদ্রীনাথকে এনে রাখা হয়। বদ্রীনাথের মন্দিরে যে বিগ্রহ দেখি সেটি শঙ্করাচার্য অলকানন্দার ব্রহ্মকুণ্ড থেকে তুলে এনে নারায়ণ পর্বতের কোলে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তী কালে সেই বিগ্রহকে ঘিরে মন্দির গড়ে ওঠে। এক সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যে হিন্দুধর্ম ভেসে যাওয়ার মতো হয়েছিল। শঙ্করাচার্য তখন হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্যে ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে চারটি মঠ স্থাপন করলেন। উত্তর দিকে গাড়োয়াল পাহাড়ে যোশীমঠ, দক্ষিণ দিকে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্ব দিকে পুরীতে গোবর্ধন মঠ এবং পশ্চিম দিকে দ্বারকায় সারদা মঠ। এই চার মঠের ভার দিলেন চারজন মহন্তের ওপর। সৃষ্টি হলো দশনামী সন্ন্যাসী

সম্প্রদায়ের। উত্তর দিকের সন্ন্যাসীরা 'গিরি', 'পর্বত', 'সাগর', দক্ষিণ দিকের সন্ন্যাসীরা 'সরস্বতী', 'ভারতী', 'পুরী', পূর্ব দিকের সন্ন্যাসীরা 'বন', 'অরণ্য' এবং পশ্চিম দিকের সন্ন্যাসীরা 'তীর্থ', 'আশ্রম' নামে পরিচিত হলেন।

এইসব কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ 'জয় বদ্রীবিশাল' ধ্বনিতে চমক ভাঙল। গতকাল ভোরবেলা হৃষিকেশ থেকে যাত্রা করেছিলাম। দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত ভাগীরথী আমাদের সঙ্গী ছিল। আমাদের বাস যতই পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়েছে আমরা ততই উঁচুতে আরও উঁচুতে উঠেছি। দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। সেখানে অলকানন্দা এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছে। ফলে অলকানন্দা আমাদের সঙ্গী হয়েছে। অলকানন্দাকে আমরা পেয়েছি একেবারে বদ্রীনাথ পর্যন্ত। অলকানন্দার তীরেই বদ্রীনাথের মন্দির।

হৃষীকেশ থেকে বদ্রীনাথ ৩০১ কিলোমিটার। মাঝখানে পড়ে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, যোশীমঠ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, গোবিন্দঘাট এবং আরও কত সুন্দর সুন্দর জায়গা। হৃষিকেশ থেকে বদ্রীনাথ আগে লোকে পায়ে হেঁটেই যেত। পথও ছিল দুর্গম। বদ্রীনাথ পৌঁছতে অনেক দিন লাগত। কিন্তু এখন পুরো রাস্তাটাই বাসে পার হওয়া যায়। প্রায় দেড় দিন সময় লাগে। রাত্রিটা কাটাতে হয় যোশীমঠে। সন্ধ্যের পর পাহাড়ী পথে গাড়ি চালানো বিপজ্জনক। তাই আইন করে রাত্রে গাড়ি চালানো নিষেধ করে দেওয়া আছে। যোশীমঠে রাত কাটিয়ে ভোরবেলা আবার বাসের যাত্রা শুরু হয়। যোশীমঠ থেকে বদ্রীনাথের দূরত্ব ৪৪ কিলোমিটার।

'জয় বদ্রীবিশাল', 'জয় বদ্রীবিশাল' ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে যাত্রীরা এগোতে লাগল। আমরা এসে পৌঁছেছি ১০,৫০০ ফুট উঁচুতে। যেখানে বাসের যাত্রাপথ শেষ হলো সেটি একটি উপত্যকা–প্রায় তিন মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া। উপত্যকায় দাঁড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করলাম। সাংঘাতিক উঁচু উঁচু পাহাড় ঘিরে রেখেছে সেই উপত্যকাকে। ঝকঝকে রোদ-ঝলমল সকাল। গলায় ক্যামেরা ঝোলানো ছিল। কয়েকটা ফটো তুলেছিলাম, তারপর টেলিফটো লেন্স লাগিয়ে ক্যামেরা ঘোরাতেই তুষারে ঢাকা দূর পাহাড়ের একটা চূড়া একেবারে যেন কাছে চলে এল। চমৎকার সে চূড়া। পাশের যাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, ওটি মানা পর্বত। একটি দশ এগারো বছরের ফুটফুটে সুন্দর ছেলে চলেছে মা-বাবার সঙ্গে। সে বাবাকে অস্থির করে তুলেছে, নীলকণ্ঠ পীক কোনটা বাবা, নীলকণ্ঠ পীক কোনটা? আমাদের মতো সে হয়তো শুনেছে নীলকণ্ঠ চূড়া দেখতে ভীষণ সুন্দর এবং তাকে বদ্রীনাথ থেকে খুব ভালভাবে দেখা যায়। বাবা তাকে বললেন, এখন তো

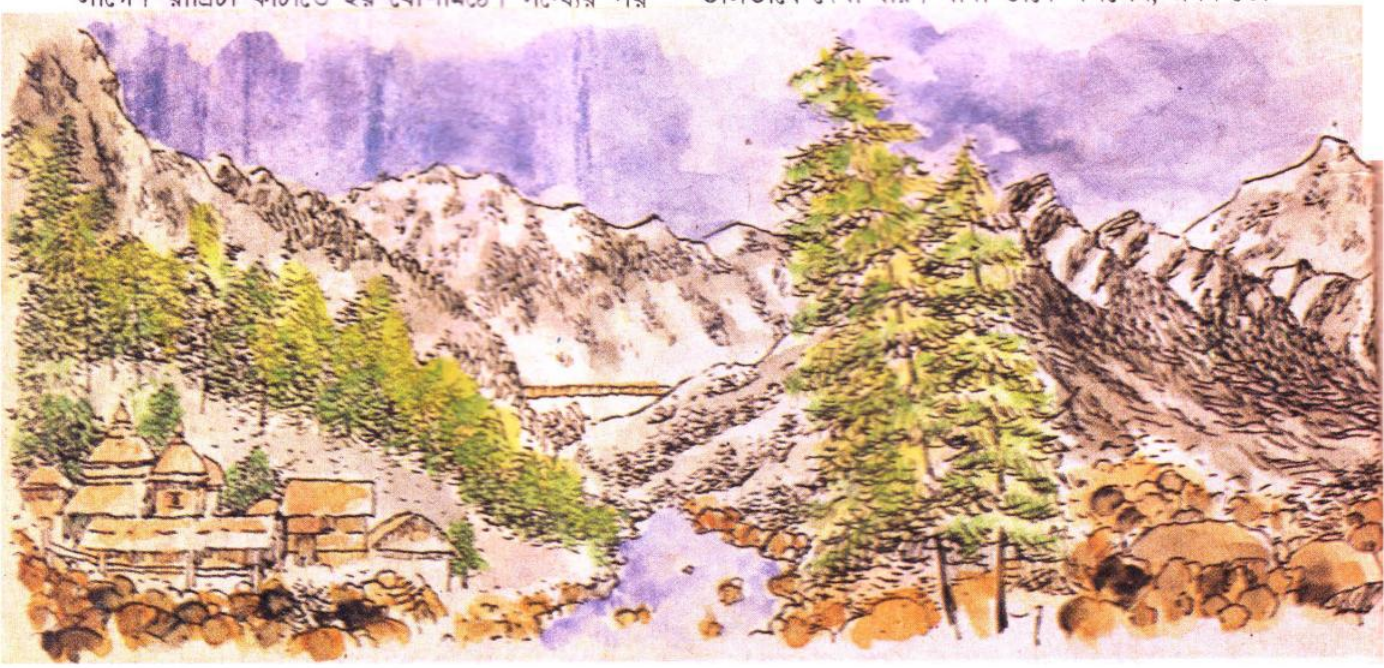

আর দেখা যাবে না। কুয়াশা যদি না থাকে কাল ভোরবেলা সূর্য ওঠার সময়ে দেখতে পাওয়া যাবে।

অলকানন্দার দক্ষিণ তীরে বদ্রীনাথের মন্দির। মন্দিরের সামনে ও পেছনে দুই পাহাড়–নর ও নারায়ণ। নারায়ণ পাহাড়ের কোলে মন্দির। পৌরাণিক কাহিনীটি ভারী সুন্দর–

এক দৈত্য মহাদেবের আরাধনা করে 'সহস্রকবচ' বর পেয়ে সহস্রকবচ দৈত্য হলো। শিবের বরে সে অজেয়। একমাত্র যার দশ সহস্র বছর সাধনা আছে কেবল তিনিই পারবেন তাকে হারাতে। বর দেওয়ার পর শিব ভীত হয়ে পড়লেন, ব্রহ্মাও ভয় পেলেন। তাঁরা নারায়ণের কাছে গিয়ে প্রতিকার চাইলেন। নারায়ণ তখন হাজির হলেন দৈত্যের কাছে। দৈত্য তো নারায়ণকে দেখেই আক্রমণ করল। নারায়ণ তখন নর ও নারায়ণ এই দুই ভাগ হয়ে যুদ্ধ শুরু করলেন। দৈত্য নর ও নারায়ণের তফাৎ বুঝতে পারছে না। যুদ্ধ চলছে। নর ও নারায়ণ এক একদিন এক এক জন যুদ্ধ করেন। একজন যখন যুদ্ধ করেন অন্যজন তখন তপস্যা করে নেন। এই রকম ভাবে নশো নিরানব্বই দিন তপস্যা করে দৈত্যের নশো নিরানব্বইটি কবচ নষ্ট করে দিলেন। বেগতিক দেখে একটি কবচ নিয়েই দৈত্য পালাল। নর ও নারায়ণ যে পর্বত দুটিতে তপস্যা করেছিলেন সেই পর্বত দুটিই নর ও নারায়ণ নামে পরিচিত।

বদ্রীনাথের মূর্তি তাই যোগস্থ। মসৃণ শ্যামবর্ণের পাষাণময় অতি রমণীয় চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। প্রবাদ, নারদ এই মূর্তিকে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৌদ্ধ লামারা ধ্যানস্থ এই বিষ্ণুমূর্তিকে বুদ্ধমূর্তি মনে করে পুজো করতেন। বৌদ্ধধর্ম তখন সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করেছে। অষ্টম শতাব্দীতে শংকরাচার্যের আবির্ভাব হলো। তিনি হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। সেই সময়ে বৌদ্ধ লামারা শংকরাচার্যের কাছে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তিব্বতে পালিয়ে গেলেন। যাবার সময় মূর্তিটিকে অলকানন্দার জলে ফেলে দিয়ে গেলেন। শংকরাচার্য এই মূর্তির কথা কিছু জানতেন না। তিনি ধ্যানমগ্ন থাকার সময়ে অলৌকিক ভাবে জানতে পারেন অলকানন্দায় নিক্ষিপ্ত মূর্তির কথা। কথিত আছে তিনি সাত বার ডুব দিয়ে তবে মূর্তিটি খুঁজে পান। অলকানন্দার যে অংশে মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল সেই অংশটি বর্তমানে নারদ কুণ্ড নামে পরিচিত। কথিত আছে বদ্রীবিশালকে নাকি নারদই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই শংকরাচার্য যে কুণ্ড থেকে বদ্রীবিশালের বিগ্রহ তুলে আনেন তার নাম নারদ কুণ্ড। বদ্রীনাথের যে মন্দিরটি আমরা এখন দেখি সেটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে মন্দিরস্বামী বরদাচার্যের অনুরোধে গাড়োয়ালের মহারাজা নির্মাণ করেছিলেন। বিগ্রহের মাথার ওপর স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপটি ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ হোলকার দিয়েছেন। আগে দণ্ডী, সন্ন্যাসী, মহন্তরা ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বদ্রীনাথের পূজারী ছিলেন। পরবর্তী কালে শংকরাচার্য নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে সেই নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে একজন রাওল বা পূজারী নিযুক্ত হন। এই প্রথা আজও চলে আসছে।

আমরা যখন মন্দিরে পৌছোলাম তখন সূর্য মেঘের

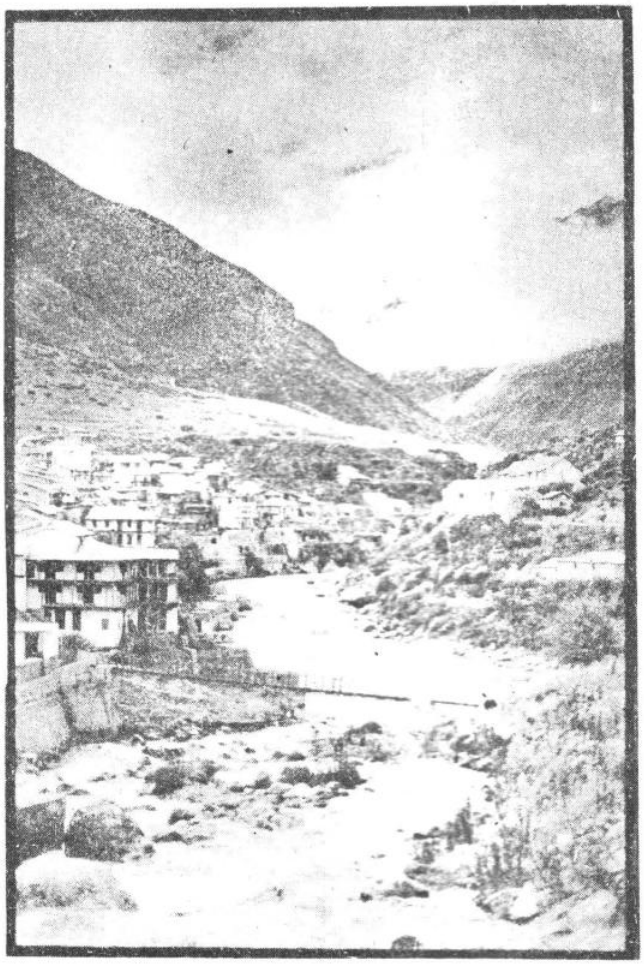

বদ্রীধামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অলকানন্দা।

আড়ালে চলে গেছে। চারিদিক ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। পাহাড়ের মাথায় মাথায় জলভরা মেঘের জটলা। পাহাড়ী জায়গায় এই বড় মজা—এই রোদ্দুর, এই বৃষ্টি। মন্দিরে ভিড় থাকলেও আমাদের বদ্রীনাথ দর্শন বেশ ভাল ভাবেই হলো।

নারায়ণের বদ্রীধামে বদ্রীবিশাল হয়ে আবির্ভূত হওয়ার কাহিনীটি হলো—দ্বাপর যুগে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ হয়ে আবির্ভূত হওয়ার উদ্যোগ করছেন যখন, সেই সময়ে দেবতারা বললেন, প্রভু, আপনি যদি শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হতে চলে যান তাহলে বদ্রীভূমি তো শূন্য হয়ে যাবে। আপনি বদ্রীভূমি ত্যাগ করবেন না। নারায়ণ তখন বলেন, দ্বাপর যুগের পরেই আসছে কলিযুগ। এই সময়ে লোকে পাপী ও ধর্মকর্মহীন হবে, সুতরাং প্রত্যক্ষ হয়ে সেখানে থাকা যাবে না। মূর্তিরূপে নারদ আমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সেই মূর্তি যে দর্শন করবে তার সাক্ষাৎ দর্শনের ফল হবে।

বদ্রীনাথ সম্পর্কে আর একটি অতি সুন্দর হৃদয়স্পর্শী কাহিনী শুনেছিলাম হৃষিকেশের সিন্ধ্রী ধর্মশালার দাদাজীর কাছে। তখন পায়ে হেঁটে বদ্রীনাথ যেতে হতো। এক বৃদ্ধ অনেক পরিশ্রম করে অনেক দূর থেকে সম্বলের শেষ কড়ি খরচ করে এসেছেন বদ্রীবিশালকে দর্শন করতে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। সব যাত্রী দর্শন করে ফিরে গেছে। পূজারীও মন্দির বন্ধ করে নেমে যাচ্ছেন।

বৃদ্ধ বললেন, আমি যে বদ্রীবিশালকে দর্শন করতে এসেছি!

পূজারী বললেন, মন্দির বন্ধ হয়ে গেল। আবার খুলবে ছমাস পরে।

পূজারী চলে গেলেন। বৃদ্ধ কেঁদে ফেললেন। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম সব বৃথা হয়ে গেল। জীবন তো তাঁর শেষ হয়ে এল। আর কি এত কষ্ট করে আবার আসতে পারবেন? এ জীবনে আর বদ্রীবিশালকে দর্শন করা হলো না।

এদিকে তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। চারিদিক বরফের সাদা চাদরে মুড়ি দিতে আরম্ভ করেছে। অলকানন্দাও আর আগের মতো উচ্ছল হয়ে বইছে না। পেঁজা তুলোর মতো বরফ যখন তার জলে জমে জমে পুরু হয়ে উঠবে সেও থমকে যাবে। কি করবেন অসহায় বৃদ্ধ? ফিরে যাওয়ার সামর্থ্য নেই। অথচ কোথায় যে আশ্রয় নেবেন, তাও জানা নেই। কেউ কোথাও নেই।

এমন সময়ে একজন যাত্রী তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন। মৃদু হেসে অসীম মমতায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

বৃদ্ধ যাত্রীকে সব বললেন।

যাত্রী তেমনি হাসিমুখে বললেন, কে বললে ছমাস পরে খুলবে। এসো ঐ গুহাটায় আমরা আজকের রাতটুকু কাটিয়ে দিই, কাল সকালে বদ্রীবিশাল দর্শনে যেও।

যাত্রীটির সঙ্গে বৃদ্ধ গল্পগুজব করে গুহায় রাত কাটাতে লাগলেন। যাত্রীটি ঝোলা থেকে ফলমূল বার করে বৃদ্ধকে খেতে দিলেন। সুমিষ্ট ফল খেয়ে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ ঘুমিয়ে পড়লেন। এক সময়ে যাত্রীটি তাঁকে ডেকে দিলেন। বললেন, ওঠো ভোর হয়ে গেছে। যাও দ্যাখোগে মন্দির খুলছে।

বৃদ্ধ গুহার বাইরে এসে দেখলেন, আশ্চর্য সুন্দর সকাল। তুষারের চাদর অপসৃত হয়েছে। গুটি গুটি পায়ে মন্দিরে গিয়ে হাজির হলেন। দেখলেন কালকের সেই পূজারী মন্দিরের দরজা খুলছেন। বৃদ্ধ একগাল হেসে

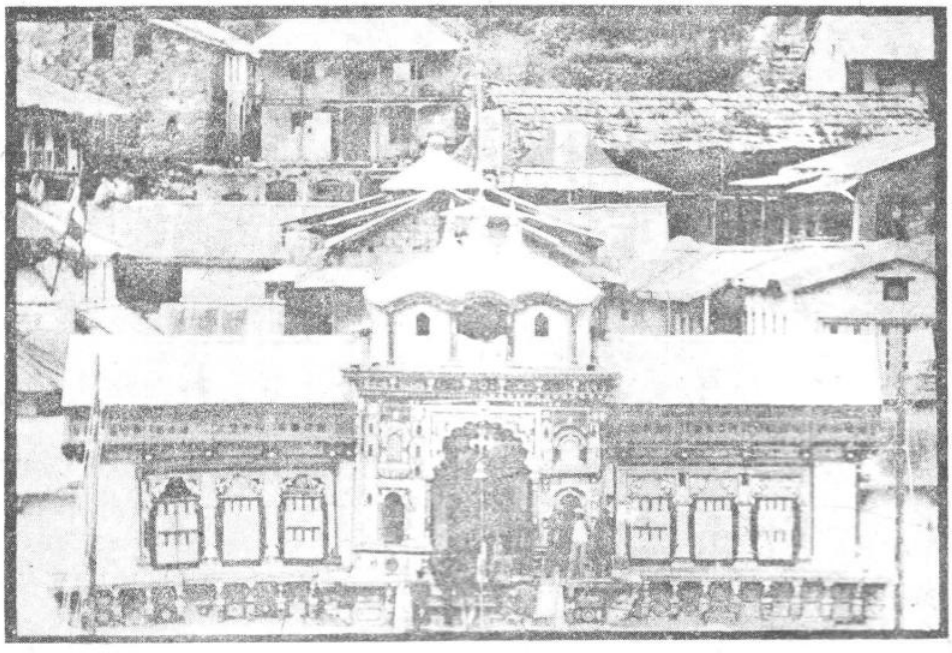

বদ্রীবিশালের মন্দির।

পূজারীকে বললেন, এই যে কাল বলে গেলে ছ মাস পরে মন্দির খুলবে ?

বৃদ্ধের কথা শুনে পূজারী অবাক ! তিনি বললেন, কি বলছেন ? ছ মাস পরেই তো খুলছি !

বৃদ্ধের কাছে সব কথা শুনে পূজারী ও যাত্রীরা তাঁর পায়ে আছড়ে পড়লেন—বৃদ্ধ, তুমি ধন্য ! স্বয়ং বদ্রীবিশাল ছ মাস ধরে তোমায় সঙ্গ দিয়ে গেলেন। তোমার মনে হচ্ছে এক রাত্তিরের ঘটনা, তা নয়। তুমি ছ মাস পরেই এলে। তুমি ধন্য !

যুগে যুগে ভগবান এইভাবেই ভক্তের আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

মন্দির বন্ধের সময়ে দু মণ ঘিয়ের একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে আসা হয়। মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকলেও ভেতরে বাতাস সঞ্চারের পথ থাকে। স্বচ্ছন্দে প্রদীপ জ্বলায় কোনো বাধা পড়ে না তাই। ছ মাস পরে বরফ সরিয়ে যখন মন্দিরের দরজা খোলা হয় দেখা যায় তখনও প্রদীপশিখা অম্লান। দ্বার খোলার আগেই যদি প্রদীপ নিভে যায় সেটা নাকি অমঙ্গলের লক্ষণ। লোকের ধারণা তাহলে সংক্রামক রোগ, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি অশুভ ব্যাপার সব ঘটতে পারে।

প্রকৃতির খেয়াল বিচিত্র। তার একটি নমুনা এখানে দেখলাম। বদ্রীনাথ মন্দিরের সামনে দিয়ে নেমে গেছে ৬৫টি সিঁড়ি। সেখানে হিমশীতল অলকানন্দা বহে চলেছে। তার কিছু ওপরে ডানদিকে গরম জলের কুণ্ড। দু'দিক থেকে দুটি গরম জলের ধারা এসে কুণ্ডের সৃষ্টি করেছে। হিমশীতল জল আর ধূমায়মান তপ্ত জল কেমন পাশাপাশি বিরাজ করছে !

থাকবার জায়গা পেয়েছিলাম মন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকে অলকানন্দা পার হয়ে 'দেবলোক হোটেলে'। পাহাড়ের নিচে সুন্দর সরকারী হোটেল। ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি গতকালের মেঘলা আকাশ আর নেই। কুয়াশা কোথায় পালিয়েছে। পরিষ্কার নীল আকাশ ঝলমল করছে। আর সামনেই দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে তুষারমৌলী বিশাল নীলকণ্ঠ শৃঙ্গকে, দূর থেকে পিরামিড আকারের একটি মন্দির মনে হচ্ছে। চূড়ার নিচে কিছু অংশ নীলাভ। এই জন্যেই কি নাম নীলকণ্ঠ ? মনে পড়ে গেল কালকের সেই ছোট ছেলেটির কথা—নীলকণ্ঠকে দেখবার তার কি আগ্রহ ! সে কি এখন নীলকণ্ঠকে দেখছে ?

ফটোঃ লেখক

আলপসের তুষার রাজ্যে ম্যাম'জেল এক্স

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। দু'বছরের ওপর হয়ে গেলো ফ্রান্স চলে গেছে জার্মানির নাৎসি বাহিনীর দখলে। কিন্তু ফরাসি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা চুপ করে বসে নেই। দেশকে স্বাধীন করার জন্যে তাঁরা গোপনে কাজ করে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে যেমন ছেলেরা আছেন, তেমনি আছেন মেয়েরাও।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় সুইজারল্যান্ড থেকে একটা ছোট্ট প্লেন গোপন এক স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। কিন্তু ফ্রান্স-ইতালির সীমানার কাছে আলপস পাহাড়ের ওপর হঠাৎ.....

মে ডে.....মে ডে.....ভীষণ বিপদ.....প্লেনের কনট্রোল হারিয়েছি.....এক্ষুণি ভেঙে পড়বে.....জায়গাটার অবস্থান ৭৩৩৬.....

লন্ডনে মুক্ত ফরাসি বাহিনীর সদর দপ্তরে সেই সাংকেতিক খবরটা এসে পৌঁছুলো.....

মঁশিয়ে কর্ণেল, নম্বর সেভেন আলপসে সেন্ট সিমিয়নের কাছাকাছি কোথাও ভেঙে পড়েছে। মনে হচ্ছে ও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি।

সর্বনাশ! ওর কাছে যে গোপন কাগজপত্তর আছে। নাৎসিদের হাতে পড়লেই মুশকিল। তুমি এক্ষুণি জায়গাটার কাছাকাছি কারো সঙ্গে যোগাযোগ করো

সেন্ট সিমিয়ন আলপসের গায় ছোট্ট একটি শহর। স্কি করার জন্যে সকলে ওখানে যান। ওঠেন হোটেলে। এখন সেখানে সামরিক অফিসাররা ছুটি কাটাতে এসেছেন।

ক'য়েক ঘণ্টা পরে সেই হোটেলে.....

আরে, এ যে একেবারে ডানাকাটা পরী। গলার স্বরও কি মিষ্টি। কি নাম ওর?

মেজর এডেলহেম, উনি ম্যাম'জেল অ্যাভরিল ক্লেরি। আমাদের দেশের একজন নামকরা অভিনেত্রী। গান তো শুনলেন। দারুণ না?

অফিসাররা অবশ্য জানতো না, অ্যাভরিল ক্লেরিই ম্যাম'জেল এক্স.....ফরাসি প্রতিরোধ বাহিনীর সিক্রেট এজেন্ট।

অ্যাভরিল ক্লেরি গান শেষ করে ক'পা এগিয়ে আসতেই একটা ছেলে এসে তাঁর হাতে একটা ফুলের তোড়া দিলো.....
আমায় দিচ্ছো.....
হ্যাঁ ম্যাম'জেল। এক্ষুণি তোমাকে গাঁয়ে গিয়ে দেখা করতে হবে গাইড জ্যাকি জিরাডের সঙ্গে।
ম্যাম'জেল লাউঞ্জের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ওঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন মেজর এডেলহেম।
ম্যাম'জেল তুমি এতো তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছো.... আর একটা গান শোনাও না!
আজ আমি বড্ড ক্লান্ত! কাল গান শোনাবো হের মেজর।
ক'মিনিট পরে.....
দড়িটা দাও..... আর শোন. কেউ যদি আমার খোঁজ করে তাকে বলে দিও– আমার শরীর ভালো নেই, আমি শুয়ে পড়েছি।
এক্ষুণি বেরুবে তো?
নিনটি আলো নিভিয়ে দিলো.ব্যালকনির সঙ্গে বেঁধে ম্যাম'জেল দড়ি ধরে নিচে নামছে....
আমি নেমে গেলেই দড়িটা তুলে নিও....
ম্যাম'জেল তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে গেলো। ডাকলো তার কাজের মেয়েটিকে।
নিনটি শীগগির আমার বেরুবার পোশাকটা দাও। জরুরী খবর এসেছে.... আমায় এক্ষুণি গ্রামে যেতে হবে।
বরফে ঢাকা পথ ধরে ম্যাম'জেল এগিয়ে চললো গ্রামের দিকে। নির্জন পথ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ব্ল্যাক আউটের ঢেউ যেন পাহাড়ে গিয়েও পড়েছে।
কিছুই বুঝতে পারছি না..... এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিরোধ বাহিনী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলো কেন? নির্ঘাৎ ভয়ংকর একটা কিছু ঘটেছে!
কি ঘটেছে? জানতে পারবে শুকতারার অগ্রহায়ণ সংখ্যায়।

নতুন ধাঁধা

১. পায়ের নিচে পড়ি
তাতেই তো দল গড়ি

–বিভাংশু দত্ত
পল্লীশ্রী/আরামবাগ
হুগলী

২. না ছাড়া পাখি
শব্দ শুনে থাকি।

–মিলন সেন
ডাঙালী কালীতলা
বোলপুর

৩. তিনে মিলে মুখ্য
মাথা কাটলে শস্য।

–প্রশান্ত কুন্ডু ও সুশান্ত মন্ডল
গৈরা/পুরন্দরপুর
বাঁকুড়া

৪. লেজকাটা জন্তু মেরে
মাথা মুড়ে তীর্থে
চলো যাই এক সাথে
শিকারের অর্থে।

–শংকর দাশ
লোকপুর/বাঁকুড়া

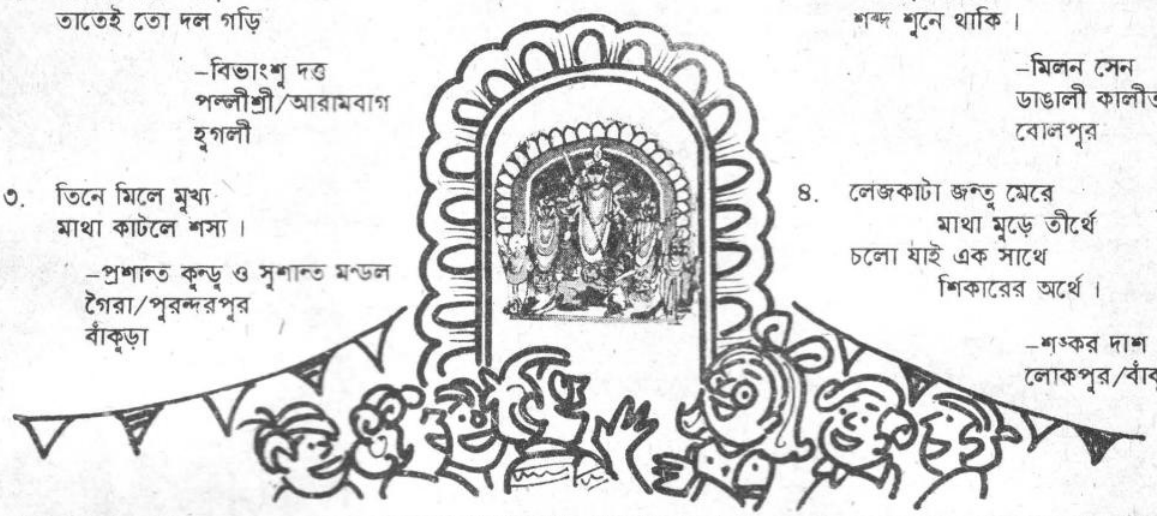

ছবিতে মজা // মানব বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগলবন্দী !

ছবি দেখে শব্দ-ছকটি সাজাও

সমাধান

১-পা, ২-তা, ৩-ক, ৪-ল, ৫-স, ৬-ব, ৭-ক, ৮-র, ৯-পা

ভাদ্র সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তর:– ১. পাতাল ২. অনবদ্য ৩. কাপালিক ৪. নাগা

আষাঢ় সংখ্যার ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

|| কলকাতা ||
চৈতালী ও জয়ন্ত বসুমল্লিক/ পি. কে. গুহ রোড; অর্ণব ও অর্পিতা পাল/রূপনারায়ণ নন্দন লেন; তুলি, বুলি, তিতলি ও তিন্নি/যাদবপুর, বাঘা যতীন; মৌমিতা সান্যাল/বিজয়গড়; পাপাইয়া বসু/রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট; মধুরিমা ভট্টাচার্য/নন্দনা পার্ক, বেহালা;

|| ২৪ পরগনা ||
পিকু, বাবু, রাজু, মণি, পাপাই, পিঙ্কি ও প্রতিমা দাস/কাস্তে পাড়া রোড (পশ্চিম), আতপুর; সোহিনী মণ্ডল/ ভাঁটা, সাউথ গড়িয়া; বুলবুল, মহুয়া, কিশোরী ও নয়না/ইছাপুর; বিলান, মিঠি, শান্তা ও বুবু/মালঞ্চ বাজার, বারুইপুর;

|| হাওড়া ||
নন্দন, রতন, উজ্জ্বল ও গৌরী বসু/ পঞ্চাননতলা রোড; বাসনা, চৈতালী, মান্না-ও কেয়া/কদমতলা; বিমল ও জয়িতা ঘোষ/শালকিয়া;

|| বর্ধমান ||
সন্দীপ পাঁজা/হাট গোবিন্দপুর, বর্ধমান; জয়দীপ, রীতা ও রীণা ভূঁইঞা/সার্কুলার রোড বাংলো, বার্নপুর; বীরেন, মনোজ ও উজ্জ্বল নায়েক/জে.সি. বসু রোড, দুর্গাপুর; শিল্পী ও সাথী/শ্রীপল্লী, আসানসোল; মৃদুল, গোমতি ও রিঙ্কু সিন্‌হা/অরবিন্দ অ্যাভিন্যু, দুর্গাপুর;

|| নদীয়া ||
মধুসূদন মণ্ডল ও শিপ্রা চৌধুরী/ফুলিয়া; অমিত ও অসিত দালাল/রেল কোয়ার্টার, মাজদিয়া; সুকুমার, অর্পিতা সরকার/আমিনবাজার;

|| মুর্শিদাবাদ ||
শাশ্বতী, কল্যাণী ও অনিমেষ রায়/ সৈদাবাদ, বহরমপুর; নরেন্দ্রকুমার জৈন/স্টেশন রোড, রেলডাঙা;

|| পুরুলিয়া ||
তুষারকান্তি ও তুহিনকান্তি মাহাতো/কুকস্ কম্পাউন্ড, নিউ কলোনি; কল্পনা, বিকাশ, পলাশ, চিত্ত, মিঠু ও মৌসুমী/লাগদা;

|| মেদিনীপুর ||
কাঞ্চন রায় ও অর্পণ রায়/গড়বেতা; কানু, ভূপাল ও তুহিন/তমলুক; সৈকত ব্যানার্জী ও সোমু ব্যানার্জী/আস্তাড়া, তমলুক; তনুশ্রী ব্যানার্জী/পাটনা বাজার, মেদিনীপুর;

|| বাঁকুড়া ||
সজল, বিপ্লব ও বুবু/গ্রাম+পোঃ গঙ্গাজলঘাটী; মৈনাক, মুনমুন ও বাবুই/স্কুলডাঙা রোড।

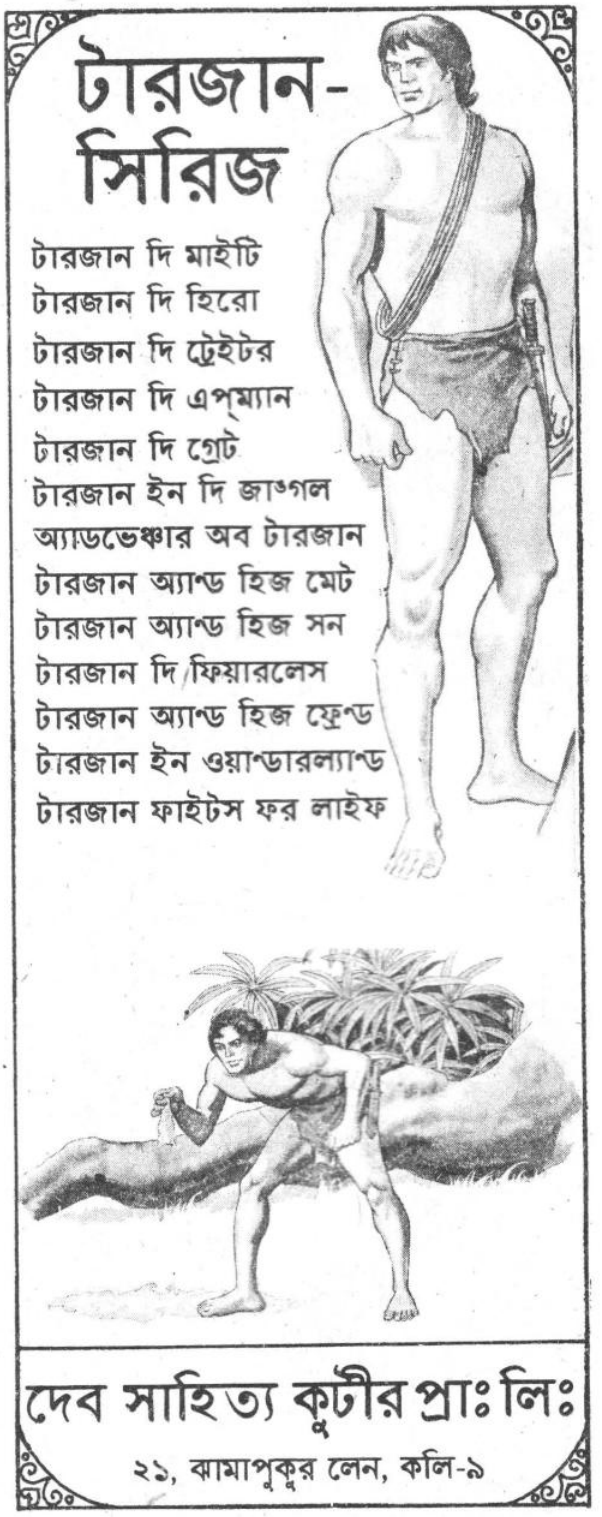

সত্যি!

ধন্যি বটে

স্বামী মেজৌগিরি মহারাজ তপস্যার উদ্দেশ্যে টানা ১৭ বছর একভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন কি ঘুমোবার সময়ও দাঁড়িয়ে একটা তক্তায় হেলান দিয়ে ঘুমোতেন। তিনি উত্তর প্রদেশের শাহজাহাপুরের বাসিন্দা ছিলেন।

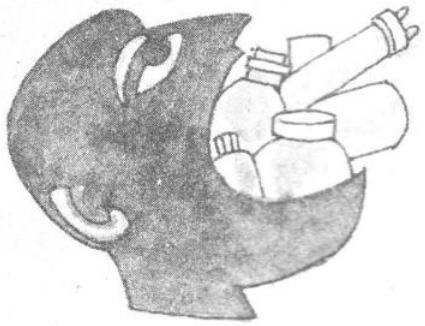

শিশি বোতল বিক্রি

ধনঞ্জয় কুলকারনির মতো আরো কয়েকজন থাকলে এই ডাক আর বেশিদিন আমাদের শুনতে হবে না। কারণ? ধনঞ্জয় বাল্ব, টিউবলাইট, জার, বোতল কিছু বাদ দেন না। সব খেয়ে ফেলেন। ১৯৮৩ সালে লন্ডনে তিনি ২,৫০০ গ্রাম কাচ মাত্র ১০ ঘন্টায় খেয়ে নিয়েছিলেন। সাবধান, তোমরা যেন ভুলেও ঐ চেষ্টা করো না।

১৪৫ বছর পরে

রিচার্ড ডড-এর প্রপিতামহ সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল গ্রন্থাগার থেকে একটি বই নিয়েছিলেন ১৮২৩ সালে। তাঁর প্রপৌত্র বইটি গ্রন্থাগারকে ফেরত দিয়েছিল ১৯৬৮ সালে।

বাহাদুর স্টান্টম্যান

১১০০ ফুট উঁচু থেকে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য স্টান্টম্যান ডার রবিনসনকে ১৯৭৯ সালে দেওয়া হয় ৪৫,৫০০ পাউন্ড। তিনি যখন মাটি থেকে আর মাত্র ৩০০ ফুট ওপরে তখন তাঁর প্যারাসুটটি খোলে। যদি না খুলতো?

একের ভেতর একষট্টি

চরিত্র একটাই কিন্তু বিভিন্ন সময় ধরে একষট্টি জন অভিনেতা তাঁকে লোকচক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। চরিত্রটি আর কেউ নন স্যার আর্থার কনান ডয়েলের অমর সৃষ্টি শার্লক হোমস্।

বড্ড ভারী টুপি

টুপিটি যে দরে নিলামে বিক্রি হয়েছিল তা জানলে টুপি মাথায় দিয়ে ভারী লাগবে বইকি। নিলাম হয়েছিল ১৪,০৩২ পাউন্ডে। আর টুপিটি ছিল সম্রাট নেপোলিয়নের। তিনি শেষ এটি পরেছিলেন ১ জানুয়ারী ১৮১৫ সালে।

বৈচিত্র্যের খোঁজে

সুইজারল্যান্ডের লোক রজার বোরবন অভিনব উপায়ে লন্ডনের একটি ম্যারাথন দৌড়ে বৈচিত্র্য নিয়ে আসেন। হাতে ট্রে নিয়ে তার ওপর খোলা জলের বোতল বসিয়ে তিনি দৌড়ে অংশ নেন। দৌড় শেষ করেন ২ ঘন্টা ৪৭ মিনিটে। দৌড়ের সময় একবারও ট্রে অন্য হাতে নিতে দেখা যায়নি তাঁকে।

ছবি: সুফি

মেরী রোজ

শোভেন সান্যাল

মাত্র কয়েক বছর আগের কথা। ইংলন্ডে মেরী রোজকে নিয়ে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল সে সময়। মেরী রোজ কে বা কি তা আমরা অনেকেই জানি না। মেরী রোজ একটি যুদ্ধজাহাজের নাম। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে পোর্টসমাউথ উপসাগরের জলে তলিয়ে গিয়েছিল এই মেরী রোজ। এই যুদ্ধজাহাজটি ছিল তৎকালীন ইংলন্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর খুবই প্রিয় রাজকীয় পতাকাবাহী যুদ্ধজাহাজ।

ইংলন্ডের ইতিহাসে এক মহা বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন রাজা অষ্টম হেনরী। ১৪৯১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম। বড় ভাইয়ের অকালমৃত্যুতে ১৫০৯ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ইংলন্ডের রাজা হন অষ্টম হেনরী খানিকটা ভাগ্যবলেই। সুপুরুষ, সুশিক্ষিত, সংগীতজ্ঞ, বহু ভাষাবিদ, ক্রীড়ানিপুণ এই তরুণ রাজার ছিল নৌবিদ্যার উপরে প্রগাঢ় অনুরাগ। সিংহাসনে বসেই তিনি রাজকীয় নৌবহরকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন।

মাত্র সাতটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে গড়া নৌবহরকে তিনি ঢেলে সাজালেন। ক্রমে ক্রমে যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা বেড়ে হলো পঞ্চাশেরও বেশি। শুধু তাই নয়, যুদ্ধজাহাজগুলোর তিনি নানারকম উন্নতি ঘটান। তখনকার যুদ্ধজাহাজগুলো ছিল পালতোলা। হেনরী পালের আয়তন বৃদ্ধি করে জাহাজগুলোর গতিবৃদ্ধি করেন। বড় বড় কামান এইসব যুদ্ধজাহাজের মধ্যে বসানোর ব্যবস্থা করে তিনি জাহাজগুলোকে প্রায় অজেয় করে তোলেন।

বৃটিশ রাজকীয় নৌবহরের ইতিহাসে ১৫১০ সাল এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বছর। ঐ বছরই মেরী রোজ তৈরি হয়। অষ্টম হেনরী তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন ভগিনীর নামে এই যুদ্ধজাহাজটির নামকরণ করেন। বহু জলযুদ্ধের নায়ক এই

যুদ্ধজাহাজ শেষবার যুদ্ধযাত্রা করে ১৫৪৫ সালে ফরাসী নৌবহরের বিরুদ্ধে। রাজা অষ্টম হেনরী নিজে পোর্টসমাউথে উপস্থিত থেকে একে বিদায় দেন। রাজকীয় নৌবহরের সংগে যুদ্ধে ফরাসী নৌবহর পরাজিত হয়। কিন্তু রাজা অষ্টম হেনরীও তাঁর অতি সাধের যুদ্ধজাহাজ মেরী রোজকে হারান এই যুদ্ধে। যুদ্ধের মধ্যেই এক প্রচন্ড সামুদ্রিক ঝড়ের পাল্লায় পড়ে মেরী রোজ আকস্মিকভাবে সমুদ্রে ডুবে যায়। সেই সংগে ডুবে যান ভাইস অ্যাডমিরাল স্যার জর্জ কেরু এবং তাঁর সংগী প্রায় ছয় শত নাবিক এবং নৌসেনানী। মেরী রোজকে হারালেও এই যুদ্ধেই প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ নৌবহর এক প্রবল শক্তিশালী নৌবহর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সেই হিসাবে রাজা অষ্টম হেনরীকেই ইংলন্ডের রাজকীয় নৌবহরের জনক বলা যায়।

মেরী রোজের সংগে এইসব সুখস্মৃতি জড়িত থাকার ফলেই ১৯৮২ সালে জাহাজটির উদ্ধার ইংরেজদের কাছে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ফকল্যান্ড যুদ্ধজয়ের আনন্দ তাদের আরও উৎসাহিত করে এ ব্যাপারে। তাছাড়া ঐতিহাসিকদের কাছেও ঘটনাটি কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ টিউডর যুগের এ ধরনের কোনো যুদ্ধজাহাজ তাঁরা আগে দেখেননি। তাই তাঁরাও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

অষ্টম হেনরী এবং মেরী রোজ

অ্যাডমিরাল ব্লেক এবং ট্রায়াম্ফ

লর্ড নেলসন এবং ভিক্টরী

লর্ড ফিশার এবং ড্রেডনট

ভাইকাউন্ট কানিংহ্যাম এবং ওয়ারস্পাইট

মেরী রোজকে খুঁজে বের করতে প্রথম সচেষ্ট হন আলেকজান্ডার ম্যাকি নামে পোর্টসমাউথের একজন লেখক এবং শখের ডুবুরী। ১৯৬৫ সালে তিনি এই জাহাজটির জন্য তল্লাশী শুরু করেন। তখন কিন্তু কোনো বিশেষজ্ঞই বিশ্বাস করতে পারেননি যে সমুদ্রগর্ভ থেকে মেরী রোজের অবশেষ এত দিন পরেও পাওয়া যাবে। তবুও হতাশ না হয়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অনুসন্ধান চালিয়ে ম্যাকি ১৯৬৭ সালে নিশ্চিত হন যে তিনি মেরী রোজের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে ১৯৭০ সালে যখন একটি কামান উদ্ধার করা হলো তখন আর ম্যাকিকে কেউ অবিশ্বাস করতে পারলেন না।

এরপর শুরু হলো সমুদ্রগর্ভ থেকে মেরী রোজের উদ্ধারপর্ব। প্রিন্স চার্লসকে পুরোভাগে নিয়ে মেরী রোজ ট্রাস্ট গঠন করে এই উদ্ধারের কাজ শুরু হলো। দেশবিদেশের ডুবুরীরা এলেন। অনেকদিন ধরে খুব সাবধানে একটু একটু করে অংশবিশেষ চিহ্নিত করে খুলে এমনভাবে তোলা হলো যাতে পরে আবার সেগুলো যথাস্থানে লাগানো যায়। তার আগে অবশ্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা নিতে হলো প্রতিটি অংশের জন্য। কারণ বহুদিন জলের মধ্যে থাকার ফলে তাদের অবস্থাও সংগীন। উদ্ধারপর্বেই খরচ হলো প্রায় আট কোটি টাকার মতো। তারপর জাহাজটির পুনর্নির্মাণ। সেই উদ্দেশ্যেই মেরী রোজকে নিয়ে যাওয়া হলো তার জন্মস্থান পোর্টসমাউথে। ঠিক হলো নতুন করে তৈরি করে তাকে রাখা হবে পোর্টসমাউথের নৌবাহিনীর জাদুঘরে, নেলসনের বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ ভিক্টরীর পাশে। রাজকীয় নৌবহরের ইতিহাসে এই দুই যুদ্ধজাহাজের অবদানের কথা ইংরাজেরা কখনও ভোলেনি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিগত ফকল্যান্ড যুদ্ধে ইংলন্ড জয়লাভ করে প্রধানত তার রাজকীয় নৌবহরের কৃতিত্বে। যুদ্ধজয়ের উপলক্ষে বৃটিশ ডাকবিভাগ রাজকীয় নৌবহরের যুদ্ধজাহাজের ছবি সমেত পাঁচটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। এই সিরিজের প্রথম ডাকটিকিটে ছিল অষ্টম হেনরী এবং মেরী রোজের ছবি। দাম ১৫ ½ পেন্স। আর যে চারটি ডাকটিকিট বেরিয়েছিল তাতে ছিল যথাক্রমে অ্যাডমিরাল ব্লেক এবং ট্রায়াম্ফ (১৯ ½ পেন্স), লর্ড নেলসন এবং ভিক্টরী (২৪ পেন্স), লর্ড ফিসার এবং ড্রেডনট (২৬ পেন্স), ভাইকাউন্ট কানিংহ্যাম এবং ওয়ারস্পাইট (২৯ পেন্স)।

রাজা অষ্টম হেনরীর পর ডাচ এবং স্প্যানিশ নৌবহরকে পর্যুদস্ত করে অ্যাডমিরাল ব্লেক (১৫৯৯-১৬৫৭) রাজকীয় নৌবহরকে এক প্রকৃত শক্তিশালী নৌবহরে পরিণত করেন। ট্রায়াম্ফ তাঁর পতাকাবাহী বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ট্রাফালগারের যুদ্ধজয়ী লর্ড নেলসন সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ নৌসেনাপতি। বহু নৌযুদ্ধের নায়ক নেলসনের ১০৪টি কামান সজ্জিত ত্রিতল ভিক্টরী জাহাজ ছিল বিখ্যাত পতাকাবাহী যুদ্ধজাহাজ। এই জাহাজেই ট্রাফালগারের যুদ্ধ পরিচালনা করতে করতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান নেলসন। বীর যোদ্ধার মৃতদেহ ভিক্টরীই নিয়ে আসেন ইংলন্ডে। সেখানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে। পালতোলা যুদ্ধজাহাজের যে ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেছিল মেরী রোজ, ভিক্টরী তারই শেষ যোগ্য উত্তরসূরী। এর পরেই শুরু হয় বাষ্পীয়পোতের জয়যাত্রা।

প্রথম মহাযুদ্ধে দুর্ধর্ষ ড্রেডনট যুদ্ধজাহাজের নৌসেনাপতি ছিলেন লর্ড ফিশার (১৮৪১-১৯২০)। এই শতাব্দীর শুরুতেই তিনি বৃটিশ নৌবহরকে আবার এক প্রবল শক্তিশালী নৌবহরে পরিণত করেন। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইতালীয় নৌবহরকে পর্যুদস্ত করে ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তির পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখার গৌরব সম্পূর্ণই ভাইকাউন্ট কানিংহ্যামের (১৮৮৩-১৯৬২)। ওয়ারস্পাইট তাঁর নৌবহরের এক বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ।

ফকল্যান্ড যুদ্ধজয় উপলক্ষে মেরী রোজ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রাজকীয় নৌবহরের এক গৌরবময় ইতিহাসকেই যে তুলে ধরেছিল ইংলন্ড তার এই পাঁচটি ডাকটিকিটের মাধ্যমে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সেজন্যই এই ডাকটিকিট প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই সমুদ্রতল থেকে মেরী রোজের উদ্ধার ইংলন্ডে অত সাড়া জাগিয়েছিল।

ছবিঃ স্বাতী ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা

রোবুর বন্ধু

ঝুমা মুখোপাধ্যায়

"ডাল নাই তার আছে পাতা,
মুখ নেই, সে বলে কথা।"

"বলো তো দাদু কি?"–পাকাচুলো মাথাটা হাসির দমকে নাড়াতে নাড়াতে দেবকুমারবাবু দশ বছরের নাতনী রিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন। রিয়া তার ছোট্ট মাথাটা বারকতক চুলকে, মাথা ঝাঁকড়িয়ে কিছুতেই উত্তর দিতে পারল না এ ধাঁধাটার। দাদু হেসে বললেন, "পারলে না তো ? এইবার তুমি হেরে গেলে। ওটার উত্তর বই।"

"বই ! সেটা আবার কি ?"

"কেন ? আমার ঘরে তাকের উপর সাজানো আছে, তুমি দেখোনি ?"

"ও, তোমার ঘরে তাকের উপর সাজানো আছে যেগুলো সেগুলো বই বুঝি ? তা তার পাতা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সে কথা বলে কি করে ? তোমার এ ধাঁধাটা একেবারে বাজে।"

"রি-য়া, ঘরে এসো"–ঘর থেকে শোনা গেল রিয়ার মায়ের গলা। লাফ দিয়ে রিয়া ঘরে ঢুকল। আপন মনে হাসতে শুরু করলেন রিয়ার দাদু। মেয়েটা একেবারে পাগল। ওর খেলার সাথী রোবটটার সঙ্গে কথা বলার থেকে দাদুর সঙ্গে বক্‌বক্ করতেই ভালোবাসে। তবে, ধাঁধাতেই বেশি আগ্রহ। তাই সুযোগ পেলেই দাদুর কাছে ধাঁধা শোনে, আর হাসিতে ফেটে পড়ে।

"ও দাদু, বই কি করে কথা বলে বললে না তো ?"–আবার লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রিয়া। আদরের নাতনীটিকে কোলের কাছে টেনে নিলেন দাদু, "বই থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। গল্প পড়ি। তাই বই কথা বলে।",

"ধুৎ দাদু, তুমি কিচ্ছু জানো না, বই থেকে পড়ব কেন ? ঐ রোবুই তো আমাকে সব কিছু জানায়, এমনকি ছবি পর্যন্ত দেখায়।"

"এটা তো ঠিক কথা, রোবুই যদি তোমাকে সব কথা জানিয়ে দেয় তাহলে তুমি বই পড়বে কেন ? কিন্তু আমার তো আর তোমার মতন রোবু ছিল না, তাই বই পড়তাম। আর বইও আমার সঙ্গে কথা বলত।"

শুনে রিয়া কিছুটা থমকে যায়। তারপরেই আবার কলকল করে ওঠে, "দাদু, আমি বই পড়ব।"

"বই পড়বি ? তোর সময় কই ? তাহলে রোবুর কি হবে ?"

"রোবুও আমার সঙ্গে বই পড়বে। তুমি চলো,আমাকে বই পড়া শেখাবে।"

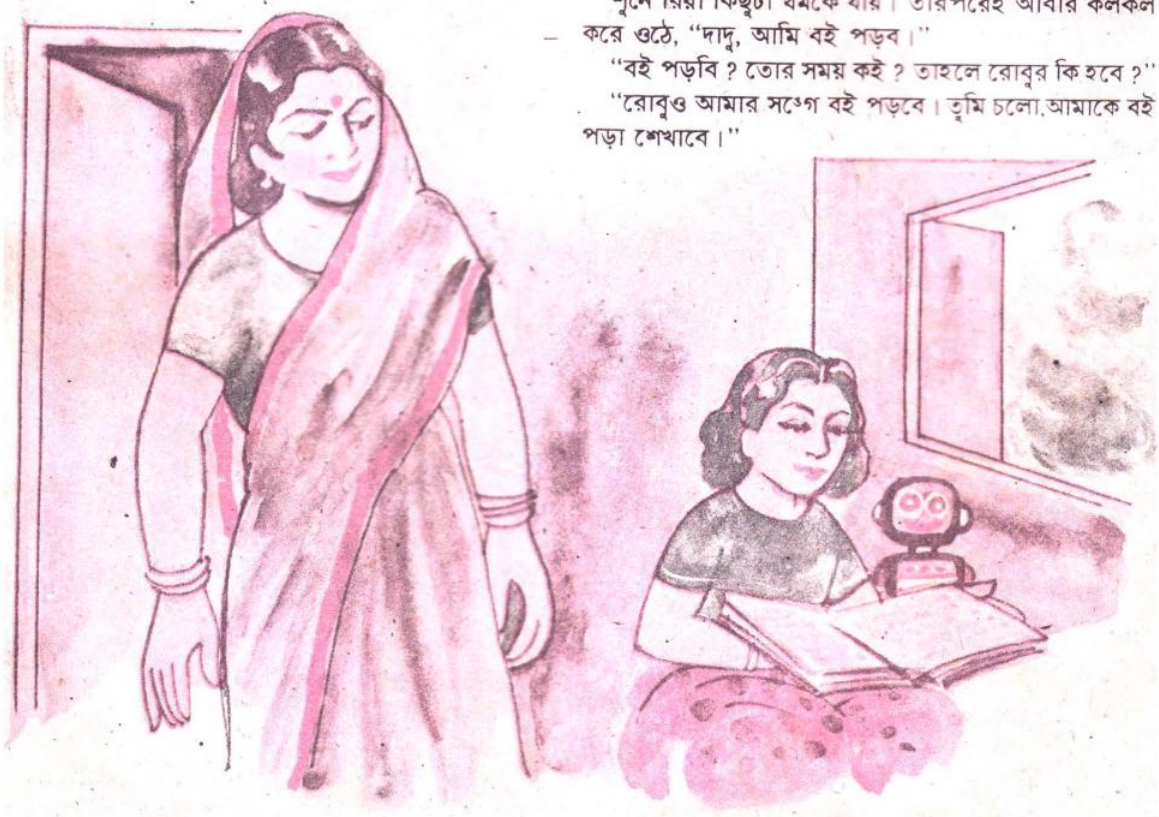

মহা উৎসাহে দাদু ও নাতনীর বই পড়া শুরু হলো। সুযোগ পেলেই নাতনীকে বর্ণপরিচয় করান দাদু, আর নাতনীও মন দিয়ে বই পড়তে শেখে।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে। যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি আসতে পারে। রিয়ার মা রিয়ার দাদুর ঘরে জানলা বন্ধ করতে ঢুকে চমকে গেলেন, দেখেন দাদুর তাক থেকে বই নামিয়ে নিবিষ্ট মনে পরে চলেছে রিয়া–

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে,
রঙের পরে রঙ,
মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা
বাজল ঢঙ্ ঢঙ্।
ও পারেতে বৃষ্টি এল,
ঝাপসা গাছপালা,
এ পারেতে মেঘের মাথায়,
একশ মাণিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে,
ছেলেবেলার গান।
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান।"

রিয়ার পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে রোবু, তার লাল চোখগুলো যেন দপ্‌দপ্ করছে।

ছবি ঃ সুফি

রবীন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা

স্বপ্নে আমার মনে হলো

মৌসুমী ভড়

পরীক্ষার মাত্র তিন দিন আগে ক্লাসে এসে বড়দিদিমণি বললেন, 'এবার মৌখিক পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে থেকে তোমাদের একটা কবিতা বা ছড়া বলতে হবে। তোমরা মুখস্থ করে রেখ।'

সকলে হৈ-হৈ করে উঠল, 'কি ছড়া দিদিমণি?'

দিদিমণি বললেন, 'যে কোনো। রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার, সুকান্ত, নজরুল যার যা খুশি। তবে, বড় নয়–দশ লাইনের মধ্যে হওয়া চাই।'

স্কুল থেকে ফিরেই সুধা মাকে জানাল ব্যাপারটা। মা বললেন, 'ঠিক আছে রবি ঠাকুরের একটা ছড়া মুখস্থ করে রেখ।'

সুধা বলল, 'তুমি বেছে দিও।'

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মার অভ্যাস একটু গড়িয়ে নেওয়া। ইচ্ছা না থাকলেও সুধাকেও মার পাশে থাকতে হয়। বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এক একদিন সুধাও ঘুমিয়ে পড়ে। সেদিন সুধা মার সঙ্গে কবিতা বাছতে বসল। সঞ্চয়িতার পাতা খুলে মা যত কবিতা বাছেন আর পড়েন সুধা তত অবাক হয়ে যায়। একবার প্রশ্ন করে, 'মা, কবিতার নিচে বৈশাখ ১২৯৬, এ রকম লেখা কেন?'

মা বললেন, 'এটা হলো কবিতার রচনা কাল।'

অবাক হয়ে সুধা বলে, 'তার মানে একশ বছর আগের কবিতা!'

মা বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ।'

সুধা আবার বলল, 'রবিঠাকুরের এক একটা কবিতা কি সুন্দর, তাই না মা?'

মা হেসে ওর গালটা টিপে দিয়ে বললেন, 'এক একটা নয়, রবিঠাকুরের সব কবিতাই সুন্দর। তুমি যত বড় হবে তত

বুঝতে পারবে।' শেষ পর্যন্ত সঞ্চয়িতাতে তেমন ছোট ছড়া পাওয়া গেল না অন্য একটা বই থেকে মা ছড়া বেছে দিয়ে বললেন, 'এটাই মুখস্থ কর।'

'ক্ষ্যান্ত বুড়ী' রবিঠাকুরের রচনা। মা যত পড়েন খিলখিল করে তত হেসে ওঠে সুধা।

'ভীষণ মজার ছড়া তাই না মা?'

মা বললেন, 'হ্যাঁ, এটাই মুখস্থ কর।' একটু পরে মা ঘুমিয়ে পড়লেন, সুধা ছড়া মুখস্থ করতে লাগল। কয়েকবার পড়ার পর সুধা বুকের উপর বইটা রেখে না দেখে ছড়াটা ভাববার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু হলো না। কালনার জায়গায় ডালনা আর জানলার জায়গায় আলনা এসে যেতে থাকল। বিরক্ত হলো সুধা। 'কি ছড়ারে বাবা! মুখস্থ হতে চায় না?'

এমন সময় জানলায় খটখট শব্দ শুনে সুধা সে দিকে তাকাল। দেখল দাড়ীওয়ালা এক বুড়ো তাকে ইশারায় ডাকছেন, মুখটা ভীষণ চেনা মনে হলো সুধার। জানলার ধারে আসতে আসতে মনে পড়ে গেল সুধার, 'আরে! ইনি তো রবিঠাকুর!' রবিঠাকুর ইশারায় সুধাকে বাইরে ডাকলেন। সুধা বাইরে এসে দেখল আলখাল্লা পরা অতি পরিচিত এক দেবমূর্তি তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। বললেন, 'কি! কেমন লাগছে ছড়াটা?'

সুধা বলল, 'ভীষণ মজার। কিন্তু মুখস্থ করতে পারছি না যে।'

রবিঠাকুর বললেন, 'চল ঐ সিঁড়িটার পাশে গিয়ে বসি। আমি তোমায় মুখস্থ করা শিখিয়ে দেব।'

সিঁড়ির পাশে বসল দুজনে। সুধা বলল, 'হঠাৎ একশো বছর পরে তুমি এসে পড়লে। কি ব্যাপার?'

হাসলেন রবিঠাকুর। বললেন, 'তুমি ভুল বললে গো সুধাদিদি। আমার কিছু কিছু কবিতার বয়স একশো বছর পার হয়ে গেছে। আমার চলে যাওয়ার বয়স একশো বছর হয়নি এখনও। দেখতে এলাম আমার একশ বছর আগের কবিতা তোমরা এখনও পড়ছো কিনা!'

সুধা বলল, 'পড়ছি কিনা মানে! কবিতার কথা এলেই তো তোমার কথা এসে পড়ে। ২৫শে বৈশাখ তুমি একবার এখানে এসে দেখবে, কি কাণ্ড-কারখানা হয়।

কি হয়?'

'চারদিকে শুধু তোমার কবিতা আর গান, নাটক আর তোমাকে নিয়ে আলোচনা। বাবা বলেছেন এবার ঐ দিন আমিও একটা তোমার কবিতা বলব। আগে পরীক্ষার ছড়াটা মুখস্থ করে নিই। কই, তুমি যে বললে আমাকে মুখস্থ করিয়ে দেবে।'

রবিঠাকুর বললেন, 'ঠিক আছে, আমি ছড়াটা বলছি। তুমি মন দিয়ে শোন আর আমার সঙ্গে বল তাহলেই মুখস্থ হয়ে যাবে।'

রবিঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে সুধাও বলতে লাগল ছড়াটা। আর কি আশ্চর্য অতি সহজেই সুধার মুখস্থ হয়ে গেল সবটা! ঠিক ঐ সময় মা ডাকলেন 'সুধা–সুধা–'

মার ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল সুধার। মার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে। মা বললেন, 'কিরে তুইও ঘুমিয়ে পড়েছিস। ছড়াটা মুখস্থ করবি কখন?'

স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে সুধা ধীরে ধীরে বলল, 'ছড়াটা মুখস্থ হয়ে গেছে মা।'

'কই, বল তো দেখি।'

সুধা এক নিঃশ্বাসে ছড়াটা বলে গেল কোথাও ভুল না করে।

আর মা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের দিকে।

ছবিঃ সৃষ্টি

এদের লেখাও ভালো হয়েছেঃ
সুব্রত পন্ডিত (বিষ্ণুপুর, গোপালগঞ্জ), মঞ্জরী বাগচী (দলমাদল রোড, বিষ্ণুপুর), চন্দ্রানী চৌধুরী (বোকারো), শৈবালকান্তি মাইতি (পুরুষোত্তমপুর); বিপ্লব পাল (বহরমপুর), আশীষকুমার ঘোষ (ঢাকুরিয়া), মাতঙ্গিনী ভট্টাচার্য (দানাঘাটা)।

ঘোষণা

বাঁকুড়া জেলার বাঁকাদহ গ্রামের শ্রীমতী অঞ্জলী গাঙ্গুলি তাঁর প্রয়াত স্বামী পঞ্চানন গাঙ্গুলির নামে একটি স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো পঞ্চানন গাঙ্গুলি স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

বিষয়বস্তু

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

পঞ্চানন গাঙ্গুলি
জন্ম: ১৯ অক্টোবর ১৯৩৭ • মৃত্যু: ১২ এপ্রিল ১৯৮২

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ অগ্রহায়ণ। পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার চৈত্র সংখ্যায় ছাপা হবে। প্রথম পুরস্কার: ৫০ টাকা: দ্বিতীয় পুরস্কার: ৩০ টাকা

হাঁদা-ভোঁদার

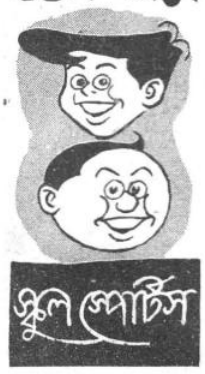
স্কুল স্পোর্টস

ছিটেতেই আনফিট হয়ে গেলি। খেয়ে খেয়ে তুই বড় বেশী গোদা হয়ে গেছিস, ভোঁদা।
স্কুল স্পোর্টস

ক্ষমতা নেই অথচ কেরদানী দেখিয়ে দৌড়ে প্রথম হওয়ার শখ। সে তো আমি হবো রে। তুই আরো খাবার খেয়ে ঘুমো।

খাবার! হাঁদা ঠিক বলেছে। আমি যখন স্পোর্টসে কিছুই করতে পারবো না তখন ঐ খাবারের তাঁবুতে চুপিসাড়ে ঢুঁ মেরে দেখি।

খাবার সাবাড় করার মতলবে তাঁবুতে ঢুকেছিস, বেরো শিগগির!
ইঃ! এখানেও অসফল।

এই, বাচ্চারা! বান আর চামচ নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াও।
ইস্! বাচ্চাদের দিয়ে এই বান আর চামচের রেস করিয়ে সুস্বাদু বানগুলোকে নষ্ট করা নেহাতই বোকামি।

কেঁদোর জন্যে রাখা হাড্ডিটা বাচ্চাদের দিকে ছুঁড়ে দিই।

চমৎকার! ওরা বানগুলো ফেলে দিয়েছে।
ঘেউ! ঘেউ!

কিন্তু মতলবটা ভেস্তে গেলো
চকাস!
চকাস!

ও সবগুলো বান খেয়ে ফেলার আগে আমি একটা তুলে নেবো!
গরর!

ঘেউ! ঘেউ!
হেল্প! হতচ্ছাড়া জেবেছে সব বানগুলো ওর।

মরেচে! দুশো মিটার দৌড়ে ভোঁদা জিতে গেলো!
আপস্! উপস্ ওফস্
ঘেউ! ঘেউ!

ভালো করে পোজ দিয়ে দাঁড়াও, কাগজে দেবার জন্যে একটা ছবি নেবো।
হুঃ!

বাণেশ্বর বিদ্যালংকার

গৌরী সেন

১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দ, কার্তিক মাস, কালীপূজার রাত্রি। হুগলী জেলার গুপ্তপল্লী, এখন যার নাম গুপ্তিপাড়া, সেই গ্রামের ঘরে ঘরে মাটির প্রদীপ সাজানো হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে। আর যারা একটু বড় তারা আগুনের ছোট ছোট মশাল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে খেলা করছে।

এ গ্রামের সবচেয়ে বড় কবি, পন্ডিত বিষ্ণুসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য। বিষ্ণুসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্যের ছেলেও একজন বড় পন্ডিত। এ বাড়ির অনেকেই সেযুগের নামকরা পন্ডিত ছিলেন। এই বাড়িতে আজ কালীপূজা, গভীর রাত্রে এ পূজা আরম্ভ হবে। এই উপলক্ষে নানা জায়গা থেকে পন্ডিতেরা এসেছেন বিষ্ণুসিদ্ধান্তের বাড়ি।

পূজা শেষ হতে হতে রাত্রি শেষ হয়ে এলো। এবার পন্ডিতেরা সবাই পূজামন্ডপে দেবীর সামনে এসে বসলেন। বিষ্ণুসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্যের ছেলে রামদেব তর্কবাগীশ বললেন, 'আমার এই আত্মীয় মথুরেশ বিদ্যালংকার, ইনি একজন বেশ ভালো কবি, মুখে মুখে এখন কবিতা তৈরি করে দেবীর বন্দনা করবেন।'

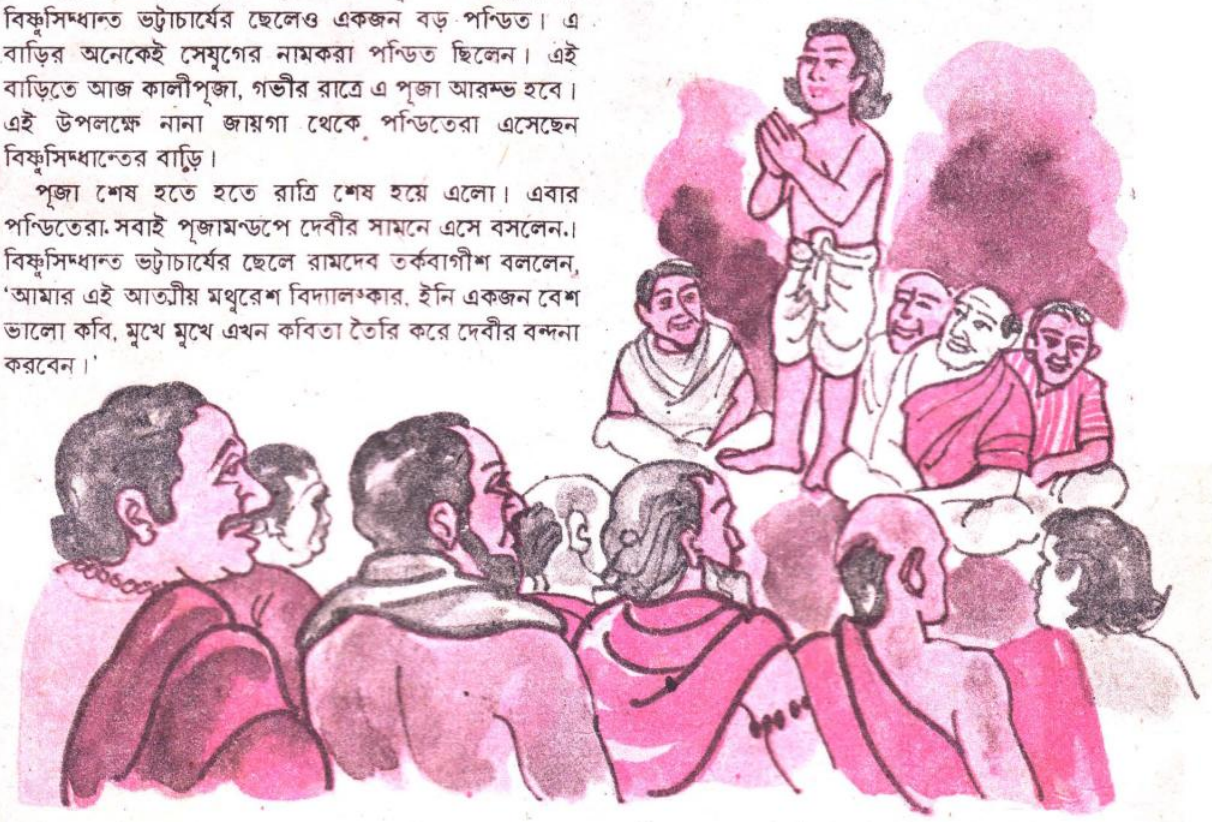

কবিতা বলা শুরু হলো। একটার পর একটা কবিতা বলে চলেছেন মথুরেশ বিদ্যালংকার, কখনও তিনি দেবী কালীর রূপ বর্ণনা করছেন, কখনও কবিতার মধ্যে দেবী কালীর গুণ ও মহিমার কথা বলছেন। একশ পাঁচটি কবিতা বলে মথুরেশ বিদ্যালংকার দেবীকে প্রণাম জানিয়ে শান্ত হয়ে বসলেন। পন্ডিত সমাজ খুব খুশি হলেন কবিতা শুনে। তাঁরা সবাই কবির প্রশংসায় সাধু-সাধু বলে উঠলেন।

এতজন বয়স্ক পন্ডিতদের মধ্যে ঘরের এক কোণে একটি সাত বছরের ছেলে একা নিঃশব্দে তন্ময় হয়ে কবিতা শুনছিল। কেউ কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করেনি।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। হঠাৎ সেদিন আবার পন্ডিতদের সভা বসেছে। আজও নানা জায়গা থেকে পন্ডিতেরা এসেছেন। মথুরেশ বিদ্যালংকারও এসেছেন। সভার কাজ আরম্ভ হবার আগে পন্ডিতদের মধ্যে একজন বললেন, 'আজকের সভা আরম্ভ হবার আগে মথুরেশ বিদ্যালংকার যদি আমাদের সেদিনের দেবী বন্দনাটি আর একবার শোনান তবে খুব ভালো হয়, বড় ভালো লেগেছিল।'

সমস্ত পন্ডিত সমাজ বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মথুরেশ বিদ্যালংকারের দেবী বন্দনা দিয়েই সভা আরম্ভ হোক। আমরা সবাই দেবী বন্দনাটি আবার শুনব।'

মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন মথুরেশ বিদ্যালংকার। কিছুক্ষণ পর অতি বিনীতভাবে বললেন, 'দেখুন, আমি সেদিন তখনই মুখে মুখে দেবী কালীর বন্দনা তৈরি করে বলেছিলাম। কয়েকদিন পরই ঐ একশ পাঁচটি কবিতা পুঁথিতে লিখে রাখতে গিয়ে দেখি কিছুই মনে করতে পারছি না। মাঝে মাঝে দু-চারটি লাইন শুধু মনে আছে। সেদিন আপনাদের সামনে বলার পরই যদি লিখে রাখতাম তাহলে এই অবস্থা হতো না।'

পন্ডিতেরা সবাই দুঃখিত হয়ে বললেন, 'মনে যখন নেই

তখন কি আর করা যাবে। তবে আমাদের সকলেরই বন্দনাটি শোনার বড় ইচ্ছা ছিল।'

'আমি বলি?' আজও ঘরের কোণে বসেছিল সেই সাত বছরের ছেলেটি। ওর কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে ওর দিকে তাকান। ছোট ছেলেটির বাবা বললেন, 'সেকি, তুই একশ পাঁচটি কবিতা বলতে পারবি?' তাঁর কণ্ঠেও বিস্ময়।

'হ্যাঁ পারব বাবা।' তারপরই সাত বছরের ছেলেটি মথুরেশ বিদ্যারত্নের অনুকরণে হাত জোড় করে দাঁড়াল, তারপর একশ পাঁচটি দেবী বন্দনার কবিতা বলে যেতে থাকে একের পর এক। একশ পাঁচটি দেবী বন্দনার কবিতা সেই সাত বছরের ছেলেটি নির্ভুলভাবে বলে গেল। সমস্ত পন্ডিত সমাজ মুগ্ধ এবং আশ্চর্য হয়ে গেছেন এই ছোট ছেলেটির অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখে। কারণ এই ছেলেটি মাত্র একবারই একশ পাঁচটি দেবী বন্দনার কবিতা শুনেছিল তাঁদেরই মতো। তাঁদের কিন্তু কিছু মনে নেই, ছেলেটির সব কবিতাগুলি কি সুন্দর মনে আছে। ঐ ছোট ছেলেটির বাবা তো আনন্দে চিৎকার করে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'বানু আমার বড় হয়ে নিশ্চয়ই খুব বড় পন্ডিত হবে।'

সেদিন পন্ডিতেরাও ঠিক সেই কথাই বললেন।

ভবিষ্যৎবাণী সফল হলো।

বাণেশ্বরের জন্মের সময় ঠিক জানা যায় না। তবে এই ঘটনার সময় যদি তাঁর বয়স সাত বছর হয় তবে আন্দাজ করা যেতে পারে, তাঁর জন্ম হয় ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। গুপ্তপল্লীতে তাঁর জন্ম। বাণেশ্বরের পড়াশুনো শুরু হলো তাঁর বাবার কাছেই। বাণেশ্বরের ঠাকুর্দা বিষ্ণুসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য সে যুগের নামকরা কবি ও পন্ডিত ছিলেনই, তাঁর বাবা রামদেব তর্কবাগীশ ছিলেন নৈয়ায়িক পন্ডিত। শোনা যায় বেদব্যাসের লেখা সমস্ত মহাভারতটি তাঁর মুখস্থ ছিল।

বাণেশ্বর বাবার কাছে অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন শাখার সমস্ত শিক্ষা শেষ করে ফেললেন। এই সময় তিনি বিদ্যালংকার উপাধি পান। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর পান্ডিত্য আর তাঁর অসাধারণ কবি প্রতিভার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এ খবর পেয়ে তাঁকে সভাকবি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বাণেশ্বর বিদ্যালংকার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি হিসাবে বেশ কিছুদিন আনন্দে কাটান। তাঁর কবিতা সেদিন রাজসভার সবাইকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ কোনো কারণে রাজসভার অন্যান্যদের সংগে মতবিরোধ হওয়াতে তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা ছেড়ে চলে যান।

এরপর কবি বাণেশ্বর মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন নবাব আলিবর্দীর কাছে। কিন্তু সেখান থেকে চলে আসেন বর্ধমানে। বর্ধমানের মহারাজা চিত্রসেন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। এখানেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'চিত্রচম্পূ' রচনা করেন, 'চন্দ্রাভিষেক' নাটক লেখেন।

চিত্রচম্পূ কাব্যগ্রন্থটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এই কাব্যগ্রন্থে বাংলায় মারাঠা আক্রমণের বর্ণনা আছে। যদিও এ বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সেদিনের বাংলার সাধারণ মানুষের দুর্দশার যে ছবি এঁকেছেন কবি তা এত সত্য ও জীবন্ত যে আধুনিক ঐতিহাসিকরাও সেভাবে বলতে পারেননি।

বইটি সম্পূর্ণ কবিতায় লেখা নয়, বাণেশ্বর কখনও কবিতা কখনও গদ্য ব্যবহার করেছেন যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে গ্রন্থটিকে সুন্দর করে তুলতে। আর তাঁর গদ্য অনেকটা পাঞ্চালী স্টাইলে লেখা।

চন্দ্রাভিষেক সাত অংকের নাটক। চাণক্য কিভাবে নন্দবংশ ধ্বংস করে চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসালেন তারই গল্প নিয়ে এ নাটক।

বর্ধমানের মহারাজা চিত্রসেনের মৃত্যুতে কবি বাণেশ্বর খুবই ব্যথিত হলেন। বর্ধমান ছেড়ে চলে এলেন তিনি।

আবার নদীয়ায় কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে এলেন'। রাজসভায় তখন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বসে আছেন, বাণেশ্বরকে দেখে খুবই খুশি হলেন। কবি বাণেশ্বর সেবার রাগ করে তাঁর রাজসভা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলে হাসতে হাসতে কৌতুক করে কবিকে বললেন, 'আবার কেন এলেন কবি?'

তার উত্তরে কবি বাণেশ্বর বিদ্যালংকার সংগে সংগে সুন্দর একটি কবিতায় উত্তর দিলেন।

'আমার মনে লজ্জা, পেটে কিন্তু আগুন
আগুনের স্বভাব উপরের দিকে ওঠা।
সে আগুন লজ্জাকে করে দিয়েছে নষ্ট,
তাইতো আবার আমাকে আসতে হয়েছে।'

কবিতা শুনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসন থেকে নেমে এসে কবি বাণেশ্বর বিদ্যালংকারকে জড়িয়ে ধরলেন।

সেখানে কিছুদিন থাকার পর কবি বাণেশ্বর কলকাতায়

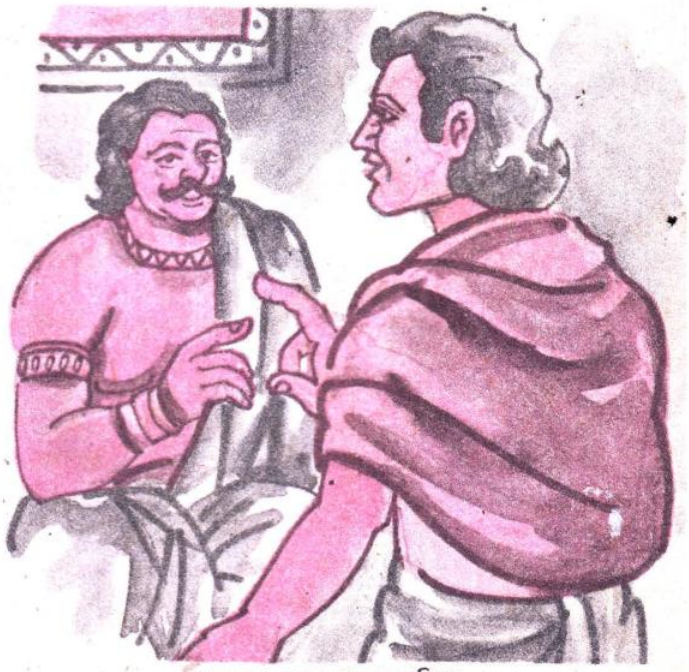

আবার কেন এলেন কবি?

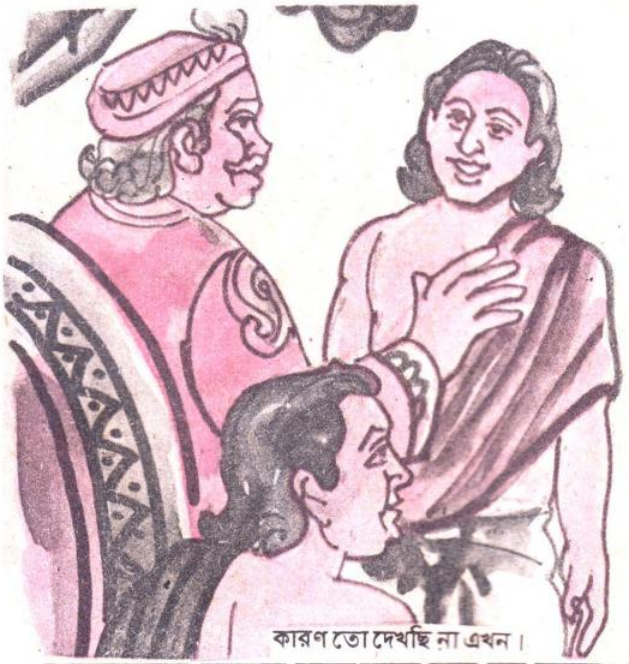

শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণদেবের কাছে চলে আসেন। মহারাজা নবকৃষ্ণদেবের গভীর শ্রদ্ধা ছিল কবি বাণেশ্বরের প্রতি। তিনি একদিন কবি বাণেশ্বরকে প্রশ্ন করলেন, 'কবি, আপনি তো বর্ধমান, নদীয়ার রাজসভা ছেড়ে চলে এসেছেন। আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন না তো?'

কবি বললেন, 'সেরকম কোনো কারণ তো দেখছি না এখন।'

কবি বাণেশ্বর যাতে অন্য কোথাও না যান তার জন্য শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণদেব আপার চিৎপুর রোডে কবির জন্য বাড়ি তৈরি করিয়ে দিলেন। কবি বাণেশ্বর সেখানে সপরিবারে বাস করতে লাগলেন।

কিছুদিন পর কবি বাণেশ্বর বিদ্যালংকার তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কাশী যান। কাশী তাঁর খুব ভালো লাগে। কাশীর প্রশংসা করে তাই তিনি লিখলেন, 'কাশীশতক।'

এ সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাল শুরু হয়ে গেছে। কোর্ট-কাছারীতে বিচারের জন্য বিধিব্যবস্থা করতে প্রথম ওয়ারেন হেস্টিংস সচেষ্ট হলেন। তিনি কোর্ট-কাছারীর কাজের জন্য 'ব্যবস্থা-পুস্তক' রচনার দিকে মন দিলেন। কারণ ব্যবস্থা-পুস্তক না হলে কোনো বিচারের কাজ ঠিকমতো চলতে পারে না। অবশ্য ওয়ারেন হেস্টিংস তখনও ভারতের গভর্নর জেনারেল হননি। তিনি সেকালের খুব বড় বড় এগারো জন পন্ডিতকে এ কাজের ভার দিলেন। এই এগারো জন পন্ডিতদের মধ্যে বাণেশ্বর বিদ্যালংকারই 'ব্যবস্থা-পুস্তক' রচনার নেতৃত্ব দেন। নানা হিন্দুশাস্ত্র ঘেঁটে পন্ডিতেরা এ গ্রন্থ রচনা করতে আরম্ভ করলেন। পন্ডিতদের এ কাজ শেষ করতে দু'বছর লেগেছিল। এই ব্যবস্থা-পুস্তকের নাম 'বিবাদার্ণবসেতু'। বইটি সংস্কৃতে লেখা। বইটির আরম্ভেই বাণেশ্বর এই এগারো জন পন্ডিতের নাম একত্রিত করে কবিতা লিখেছেন।

এ সময় খুব কম ইংরেজ জজ সংস্কৃত বুঝতেন। কোর্ট-কাছারীতে তখন ফারসী ভাষার জোর চলন। তাই সংস্কৃত 'বিবাদার্ণবসেতু' গ্রন্থটি প্রথমে ফারসীতে পরে ইংরেজীতে অনূদিত হলো। এই গ্রন্থটি ব্রিটিশ আমলে হিন্দু আইনের আদিগ্রন্থ এবং দীর্ঘদিন সুপ্রীম কোর্টের একমাত্র আইনগ্রন্থ ছিল।

কলকাতায় থাকার সময় তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব গ্রন্থের অনুসরণে 'রহস্যামৃত' গ্রন্থ রচনা করেন। বাণেশ্বর বিদ্যালংকার অনেক খন্ডকাব্য রচনা করেছেন। যেমন হনুমত স্তোত্র, শিব স্তোত্র, তারা স্তোত্র, দেবী স্তোত্র প্রভৃতি। তবে তাঁর উদ্ভট কবিতা এবং মুখে মুখে তৈরি করে বলা কবিতার জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর মিষ্টি সুরেলা কবিতা 'যমুনা ও গোবিন্দদেব' সে যুগে মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর অন্যান্য কবিতার মধ্যেও মধুরতা ও সৌন্দর্য তো ছিলই, সেইসঙ্গে ভাবের গভীরতা, কখনো কখনো রূপক ও দ্ব্যর্থ অর্থ থাকায় শ্রোতাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। কিন্তু খুবই দুঃখের ব্যাপার তাঁর এসব কবিতা এখন প্রায় পাওয়াই যায় না। তাঁর পান্ডিত্য ও অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা ছিল বলেই তিনি যে রাজসভায় গেছেন সেখানেই সাদরে সবাই তাঁকে গ্রহণ করেছেন। সকলেই তাঁকে যথেষ্ট সম্মান দিতেন। রাজা কালীকৃষ্ণদেবের সভাপন্ডিত রামচন্দ্র তর্কালংকার তাঁর 'মানব-মালতী' গ্রন্থে মহারাজা নবকৃষ্ণের নবরত্ন সভার যে ছবি এঁকেছেন, তাতে আছে, 'মহাকবি বাণেশ্বর নদের শংকর।'

বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি তাঁর লেখার মধ্যে সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামিকে কোনোদিন প্রশ্রয় দেননি। তাঁর লেখার মধ্যে বৈষ্ণব ভাব-ভাবনা-দর্শনের যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি শাক্ত মতবাদের প্রতিও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল।

তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন নিজের জ্ঞান ও কাব্য-প্রতিভা দিয়ে সকলকে আনন্দ দিয়েছেন। আর তাইতো বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই অতি দুঃখে বলেছেন,

'বিদ্যা বিরামঃ কবিতা বিরামো
বাণেশ্বরে ব্রহ্মগতে বিরামঃ।
বাণীমুখাম্ভোজগিরাজ পৃথ্বী
হীনাধুনা রত্নবিভূষণেন।।'

অর্থাৎ বাণেশ্বরের মৃত্যুতে বিদ্যা অবসর নিয়েছেন, কবিতাও বিরাম নিয়েছেন, সরস্বতীর মুখকমলের বাণী আর পৃথিবী এখন রত্নহীন।

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান; তারপর যে-মোড়টা পড়বে, সেইখানে ডানদিকে ঘুরে কয়েকটা বাড়ির পরেই একশো আট নম্বর পাবেন।
তুমি ভাই, একটু কষ্ট করে গাড়িতে চড়ে আমাদের বাড়িটা দেখিয়ে দাও। তোমাকে আমরা তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেব।
এতে আর কষ্টের কী আছে বলুন? আপনারা যে-বাড়িতে যেতে চান, তার দুটো বাড়ির পরেই আমাদের বাড়ি। বরং আমার সুবিধা হল, গাড়িতে গেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাব।
সে তো ভালো কথা। তাহলে চটপট গাড়িতে উঠে বসো।
অতিথি
ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী
কার্তিক ১৩৯৭
গাড়িতে উঠলে আর বাড়ি ফিরতে পারবে না।
কে?
হঠাৎ মাঠের উপর থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর!
কে?
এই ছোঁড়া কী বললি তুই?
তুই-তোকারি করবে না। ভদ্রভাবে কথা বলো।

(চলবে)

সিলাচি